কার্প-গলদার মিশ্রচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য ঃ প্রশিক্ষণার্থীদের মাছ ও চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান উন্নয়ন করা হবে যাতে তাঁরা উৎপাদন পুকুর/ঘেরে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কারিগরী জ্ঞান আয়ত্ব ও প্রয়োগ করতে পারেন।

উদ্দেশ্যাবলী ঃ কোর্স শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ

- চাষযোগ্য মাছ ও চিংড়ির বৈশিষ্ট্য, জীবন চক্র ও চাষের সম্ভাবনা বর্ণনা করতে পারবেন
- মাছ চাষোপোযোগী পুকুর ও ঘেরের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে পারবেন
- মাটি ও পানির ভৌত রাসায়নিক গুণাগুণ সম্পর্কে বলতে পারবেন
- পুকুর প্রস্তুতির ধাপগুলোর তালিকা তৈরী করতে পারবেন
- একক ও মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে মাছ ও চিংড়ির মজুদ ঘনত্ব ও মজুদ হার ব্যাখা করতে পারবেন
- সম্পূরক খাদ্যের গুরুত্ব, খাদ্য তৈরী ও প্রয়োগ, সংরক্ষণ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন
- মাছ চাষে উদ্ভুত সাধারণ সমস্যা ও উহাদের প্রতিকার ব্যবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন
- মাছের সাধারণ রোগ ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলতে পারবেন
- মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলতে পারবেন
- মাছ চাষের সম্ভাব্য আয়-ব্যয় সম্পর্কে বলতে পারবেন
- পুকুর/ঘেরের উৎপাদন পরিকল্পনা তৈরি করতে সমর্থ হবেন

পুকুর/ঘের নির্বাচন

মাছ ও চিংড়ি উৎপাদনের সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে উপযুক্ত স্থান বা পুকুর/ঘের নির্বাচনের উপর। সে কারণে উপযুক্ত স্থান পুকুর/ঘের নির্বাচনে অনেকগুলো বিষয় বিবেচনা করতে হয়। নীচে পুকুর/ঘের নির্বাচনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় উল্লেখ করা হলো।

১. বাৎসরিক ও মৌসুমী উভয় ধরনের পুকুর বা ঘের মাছ ও চিংড়ি চাষের উপযোগী।
২. মাছ চাষের জন্য ভাল মাটি হলো দোআঁশ (Loam) এবং কাঁদাযুক্ত দোআঁশ (Clay loam) পলি কাঁদাযুক্ত দোআঁশ (Silty clay loam), পলিযুক্ত কাঁদা (Silty clay) বা কাঁদা (Clay)। পুকুর/ঘেরের বালিযুক্ত দোআঁশ (Sandy loam) মাটির গঠনে ৩০% এর কম বালি থাকলে তাও মাছচাষের জন্য উপযোগী।
৩. পুকুর/ঘের বন্যামুক্ত ও সূর্যালোকিত স্থানে হওয়া।
৪. পুকুর/ঘেরে পানির গভীরতা ১.৫-২ মিটার হওয়া।
৫. পুকুর/ঘেরের ঢাল ১:২ হলে ভাল হয়।
৬. পুকুর/ঘেরের তলদেশে ৪-৫ ইঞ্চির বেশী পঁচা কাদা থাকা উচিত নয়।
৭. সর্বোচ্চ পানির স্তর থেকে পুকুর/ঘেরের পাড় কমপক্ষে ১ ফুট বেশি উঁচু হওয়ো আবশ্যক।
৮. আশে পাশের উৎস হতে দূষণমুক্ত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা থাকলে ভাল হয়।
৯. পরিবহন ও বাজারজাতকরণের জন্য ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা আবশ্যক।

১০. নিকটবর্তী উৎস হতে পোনা/পিএল/জুভেনাইল সংগ্রহের সুযোগ থাকলে ভাল হয়।

১১. চিংড়ির জন্য তৈরী খাদ্য বা খাদ্য উপকরণ সহজলভ্য হওয়া।

১২. আশে পাশে বাজারজাতকরণের সুযোগ থাকা।

১৩. মাছ বা চিংড়ি চাষে আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা ও সুযোগ সুবিধা থাকা।

পুকুর/ঘেরের ধরণ

দু'ধরনের জলাশয়ে প্রধানতঃ কার্প জাতীয় মাছ ও গলদা চিংড়ি চাষ করা যায়; পুকুর এবং ঘের। ঘের হচ্ছে এক খন্ড নীচু জমি যার ভেতর খাল কেটে চার দিকে বাঁধ দিয়ে চিংড়ি চাষ করা হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে প্রচুর সংখ্যক ঘেরে মাছ, চিংড়ি ও ধান চাষ করা হয়ে থাকে। পানির প্রাপ্যতা ও চাষের ধরন অনুযায়ী মাছ/চিংড়ি চাষের পুকুর ও ঘেরগুলো আবার দু'ধরনের। যেমন-

পুকুর

১. মৌসুমী পুকুরঃ যে সমস্ত পুকুরে বছরে সারা বছর পানি থাকে না তাকেই মৌসুমী পুকুর বলে। এ সমস্ত পুকুরে

- পানির গভীরতা ০.৬- ২ মিটার (২-৭ ফুট) পর্যন্ত হতে পারে
- নাইলোটিকা, সরপুঁটি এবং শিং-মাগুরের চাষ করা যায়
- রুই-কাতলা জাতীয় মাছের পোনা ও চাষ করা যায়
- প্রাকৃতিক ও বন্যায় প্লাবিত মাছ আটকিয়েও লালন-পালন করা যায়
- চিংড়ি চাষ করা যায়।

উদাহরণ ঃ বাড়ির পাশের ডোবা,খাদ ছোট পুকুর এবং বালি মাটির ছোট, মাঝারি ও বড় পুকুর।

২. বাৎসরিক পুকুরঃ যে সমস্ত পুকুরে সারা বছর পানি থাকে, তাকেই বাৎসরিক পুকুর বলে। এ সমস্ত পুকুরে

- পানির গভীরতা ১.২৫-২.৭৫ মিটার (৪-৯ ফুট) বা তারও বেশি হতে পারে।
- দেশীয় রুই-কাতলা জাতীয় (দেশীয় কার্প) মাছের সাথে চীনা কার্প মাছের মিশ্র চাষাবাদ করা যায়।
- চাষযোগ্য মাছের নার্সারি এবং লালন পুকুর হিসেবেও ব্যবহার করা যায়।

ঘের

১. ধান ও চিংড়ি চাষের ঘের

২. সারা বছর চিংড়ি চাষের ঘের

উভয় ধরনের পুকুর ও ঘের যেখানে বছরে ৬-৮ মাস কমপক্ষে ১.৫-২ মিটার পানি থাকে সেখানেই কার্প জাতীয় মাছ ও গলদা চিংড়ি চাষ করা যেতে পারে।

আদর্শ পুকুর/ঘেরের বৈশিষ্ট্য

- পুকুরের পাড় আগাছা ও ঝোপঝাড় মুক্ত হবে
- পুকুরে তলা সমান থাকবে
- ডালপালা যুক্ত বড় গাছ পুকুর পাড়ে থাকবে না
- দিনের ৬-৮ ঘন্টা যাতে সূর্যের আলো পুকুরে পড়তে পারে সে ব্যবস্থা থাকবে
- পুকুরে বকচড় থাকবে
- মাটির প্রকারভেদ পুকুরের ঢাল ১ঃ১ বা ১ঃ২ হবে
- সারা বছর পানি ৬-৭ ফুট থাকবে
- পুকুর পাড় মজবুত ও বন্যামুক্ত উচ্চতায় হতে হবে এবং পাড়ের পাড় ৫ ফুট হওয়া উচিত
- পুকুরের মাটি দো-আঁশ ধরনের হওয়াই সর্বোত্তম।
- বসতবাড়ির কাছাকাছি হতে হবে।
- পুকুরের তলায় জৈব পদার্থের পরিমাণ ১-২% জৈব কার্বন থাকবে
- পুকুর আয়তাকার হবে
- কাদার পরিমাণ ৪-৬ ইঞ্চি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মিশ্রচাষে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিঃ

মিশ্র চাষে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চার ধরনের হতে পারে যেমন:

ক. ব্যাপক পদ্ধতির চাষাবাদঃ

রাক্ষুসে ও বাজে মাছ সম্পূর্ন দূর করা হয় না। খুব কম অথবা খুব বেশী মজুদ ঘনত্ব, পানি বদল ও বাতাস সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। মাঝে মাঝে সার ব্যবহার করা হয়।

খ. আধা নিবিড় পদ্ধতির চাষাবাদঃ

রাক্ষুসে ও বাজে মাছ সম্পূর্ন দূর করা হয়। মধ্য স্তরের মজুদ ঘনত্ব, প্রয়োজনে মাঝে মাঝে পানি বদল ও বাতাস সরবরাহের ব্যবস্থা, নিয়মিত সার এবং হাতে তৈরী খাদ্য প্রয়োগ, ছাড়ার ৩-৪ মাস পর থেকে মাঝে মাঝে প্রয়োজনে মাছ ও চিংড়ির আংশিক আহরণ করা হয়।

গ. নিবির পদ্ধতির চাষাবাদঃ

নিয়মিত পানি বদল ও বায়ু সঞ্চালনের আধুনিক ব্যবস্থা, উন্নত মানের পরিপূর্ন খাদ্য প্রয়োগ, অধিক মজুদ ঘনত্ব।

ঘ. অতিনিবির পদ্ধতির চাষাবাদঃ

অবিরত পানি বদল ও বায়ু সঞ্চালনের আধুনিক ব্যবস্থা, উন্নত মানের সুষম খাদ্য প্রয়োগ, অধিক মজুদ ঘনত্ব।

বাংলাদেশের মাছচাষীদের আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে এখানে আধানিবির চাষ পদ্ধতির উপর আলোচনা করা হলো।

কার্প ও গলদা চিংড়ি চাষের পর্যায়সমুহঃ

চাষাবাদ কার্যক্রম মূল তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত যেমন: (ক) মুজদ-পূর্ব ব্যবস্থাপনা, (খ) মজুদ কালীন ব্যবস্থাপনা এবং (গ) মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা।

(ক) মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপনা

মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপনা বলতে মূলতঃ পুকুর প্রস্তুতিকেই (pond preparation) বুঝায়। এতে মূল কাজ ১০ টি।

১. পুকুর শুকানো, পাড় ও তলা মেরামত (pond drying, dike and bottom repair)
২. ছাঁকনি স্থাপন/মেরামত (construction /repair of water control structures with filters)
৩. বেড়া দেয়া/ ঘেরাও তৈরি (fencing)
৪. আগাছা দূরীকরণ ও পাড় পরিষ্কার (weed control and dike cleaning)
৫. রাক্ষুসে ও বাজে মাছ দূরীকরণ (predator and undesirable species control)
৬. চুন প্রয়োগ (liming)
৭. সার প্রয়োগ (fertilization)
৮. পোনা প্রাপ্তির চুক্তি (fry collection)
৯. পানির প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা (Testing natural plankton's productivity)
১০. পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা (Testing toxicity of water)
১১. চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে আশ্রয়স্থল স্থাপন (Construction of shelter for prawn)

(খ) মজুদ কালীন ব্যবস্থাপনা

পোনা ছাড়ার সময় ০৬টি কাজ

১. পোনার প্রজাত নির্বাচন (Species selection)
২. মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ (Stocking density determination)
৩. ভাল ও খারাপ পোনা/জুভেনাইল সনাক্তকরণ (Selection of quality fingerling/juvenile)
৪. পোনা পরিবহণ (Fry transport)
৫. পোনা শোধন করা (Fry decontamination)
৬. পোনা অভ্যস্থকরণ ও ছাড়া (Fry acclimatization and release)

(গ) মজুদ পরবর্তী করনীয় কাজ

পোনা ছাড়ার পরের ০৭টি কাজ

১. পোনা বাঁচার হার নির্ধারণ (Fry survivability determination)
২. মজুদ পরবর্তী সার প্রয়োগ (Post-socking fertilization)
৩. সম্পুরক খাদ্য প্রয়োগ (Supplimentary feeding)
৪. নমুনায়ন (Sampling)
৫. মাছ ধরা, বিক্রয় ও বাজারজাতকরণ (Fish harvesting, sale and marketting)
৬. পুনরায় পোনা মজুদকরণ (Re-stocking)
৭. রেকর্ড সংরক্ষণ (Record keeping)

১. পুকুর শুকানো এবং পাড় ও তলা মেরামত (pond drying, dike and bottom repair)

পুকুর শুকানো

মাছ চাষ শুরুর পূর্বে পুকুর শুকিয়ে নিয়ে পুকুরের সার্বিক প্রস্তুতির কাজ করা সবচেয়ে উত্তম। অবাঞ্চিত পোকা -মাকড়, রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ মারার জন্য শুকানো সবচেয়ে ভাল। শ্যালো পাম্প ব্যবহার করে এ কাজটি করা যায়। শুকানোর পর কড়া রোদে পুকুর বেশ ক'দিন ফেলে রাখতে হবে যেন তলা দিযে হেঁটে গেলে পায়ের দাগ পড়ে কিন্তু পা দেবে না যায়। এ কাজটি ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে করলে খরচ ও সময় দুই-ই কম লাগে। পুকুর শুকানোর অনেক উপকারীতা, যার কিছু নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

পুকুর শুকানোর উপকারীতা

- শুকনো পুকুর হতে জলজ আগাছা অপসারণ করা সহজ হয়।
- শুকনো পুকুরের রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ সহজে আহরণ করা যায়।
- পুকুরের তলার অতিরিক্ত জৈব পদার্থ (পেরী) অপসারণ করা যায়।
- তলা সমতল করা সহজ হয়।
- পুকুর শুকানো হলে রৌদ্রতাপে তলার রোগজীবানু মারা যায়।
- শুকনো পুকুরে চাষ দেয়ার মাধ্যমে তলার বিষাক্ত গ্যাস দূরীভূত হয়, মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়, রৌদ্রের তাপে মাটি ভালভাবে জীবানুমুক্ত হয়।
- শুকনো পুকুরের পাড়ে ও তলায় চুন ও সার দেয়া সহজ হয়।
- শুকনো পুকুরে মাছ চাষের জন্য দূষণমুক্ত, বিশুদ্ধ পানি প্রবেশ করানো যায়।

কালো কাদা আপসারণ না করলে

- পুকুর/ঘেরের পানি দুষিত করে ফেলে।
- পুকুরের তলায় অবায়বীয় দহনের (decomposition) ফলে ক্ষতিকর গ্যাস সৃষ্টি হয়।
- মাছ ও চিংড়ির জন্য অক্সিজেন স্বল্পতা দেখা দেয়
- পুকুর/ঘেরের তলায় অতিরিক্ত জৈব পর্দাথ (পেরী) থাকলে তলায় বিষাক্ত গ্যাস জমা হয়
- চিংড়ির রং কালো হয়ে যায় ফলে বাজার মূল্য কমে যায়
- সহজেই নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়ে চিংড়ির মড়ক দেখা দেয়

চিত্র-১: পুকুরের পাড় ও তলা মেরামত।

পাড় ও তলা মেরামত না করলে

- বাইরে থেকে রাক্ষুসে প্রাণী ও অবাঞ্চিত মাছ প্রবেশ করতে পারে
- বর্ষা বা অতিরিক্ত বৃষ্টির সময় মাছ ও চিংড়ি ভেসে যেতে পারে
- বাইরের দূষিত ও ঘোলা পানি পুকুরে প্রবেশ করতে ও পুকুর ভরাট হয়ে যেতে পারে
- তলা সমান না হলে জাল টানা অসুবিধা হয় এবং মাছের বাসস্থানের সুষম বন্টন নিশ্চিত করা যায় না।
- তলা অসমান থাকলে চিংড়ি আহরণ করা যায় না, মাছ আহরণে বিশেষ অসুবিধা হয়।

২. ছাঁকনি স্থাপন/ মেরামত (construction /repair of water control structures with filters)

পুকুর/ঘেরে পানি ঢুকানো ও বের করার ব্যবস্থা থাকলে উভয় পথে ছাঁকনির ব্যবস্থা করতে হবে। রাক্ষুসে ও বাজে মাছ বা তার পোনা যাতে ঢুকতে না পারে তার জন্য ছাকনি স্থাপন করা হয়। পানি ঢুকানোর পথের ছাঁকনিটি দু'স্তর বিশিষ্ট হতে হবে। এর প্রথমটির ফাঁস হবে ১.৫ মিমি এবং দ্বিতীয়টির ফাঁস হবে ০.৫ মিমি। পানি বের হবার পথে একটি ছাকনি থাকলেই চলে। এ জালের ফাঁস হবে ১.৫ মিমি। ছাঁকনির বাইরে একটি নিরাপত্তা বানার ব্যবস্থা রাখলে মূল ছাঁকনিটির কার্য ক্ষমতা বাড়ে ও টেকসই হয়। পুরাতন ছাকনি পুকুর/ঘের প্রস্তুতিকালেই মেরামত করে নেয়া উচিৎ। রাসায়নিক বর্জ্যমুক্ত খালের কাছের পুকুরে/ঘেরে ছাঁকনির ব্যবস্থা রাখা ভাল। প্রয়োজন অনুযায়ী পানি বদল করার সুবিধা কাজে লাগানো যায়।

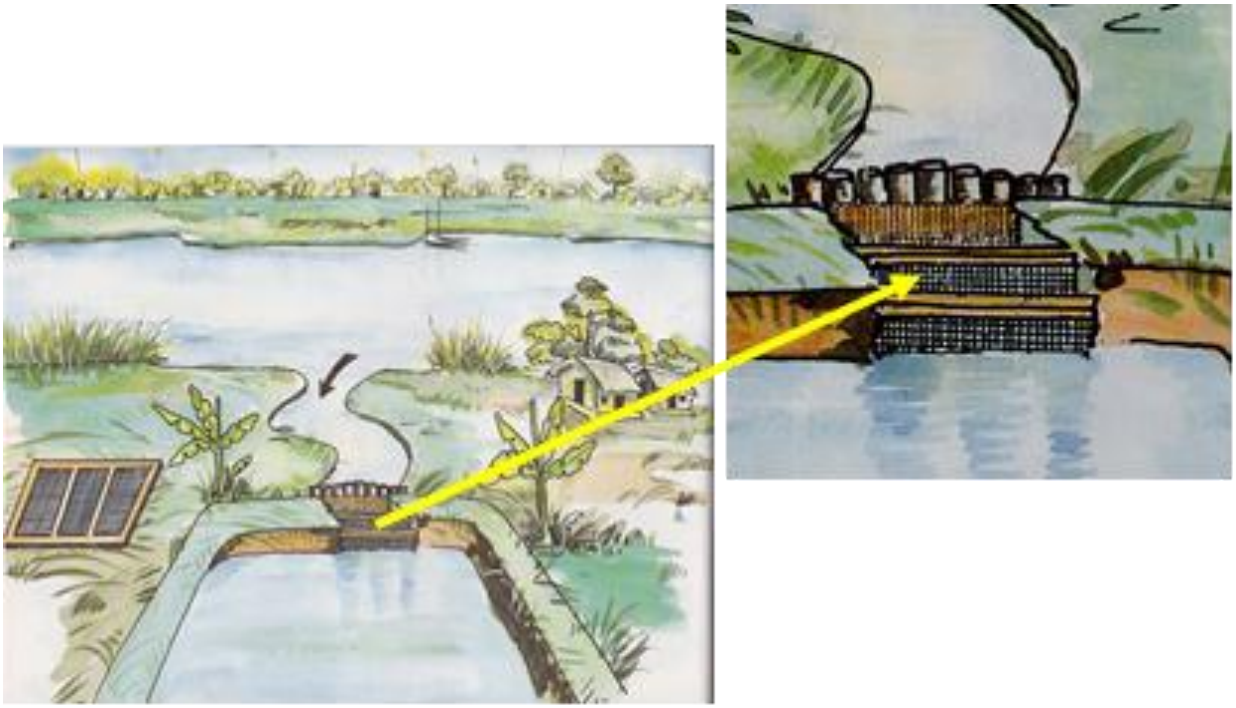

চিত্র-২: পুকুরে ছাঁকনি স্থাপন।

৩. বেড়া দেয়া/ ঘেরাও তৈরি (fencing)

পুকুরের চার পাশে ১-১.৫মিটার উচুঁ জাল বা বানা দিয়ে ভালভাবে ঘেরাও করা প্রয়োজন। ঘেরাও করার সুবিধাগুলি নিম্নরুপ-

- পুকুরে রাক্ষুসে ও অনাকাঙ্খিত প্রাণী যেমন- গুইসাপ, সাপ, ব্যাঙ ইত্যাদি প্রবেশ করতে পারে না।
- বর্ষার অতিবর্ষণের সময় মাছ বের হতে পারে না।
- কোন কারণে পাড় ডুবে গেলেও মাছ ভেসে যেতে পারে না।
- পুকুরের উপর জাল দিয়ে ঘেরাও করা হলে পাখির উপদ্রব কমে যায়।
- পুকুর পাহাড়া দেয়া সহজ হয়।

৪. আগাছা দূরীকরণ ও পাড় পরিষ্কার (weed control and dike cleaning)

যেসব জলজ উদ্ভিদ মাছ চাষের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে তাদেরকে আগাছা বলা হয়। পুকুর পাড়ে জন্ম নেয়া আগাছা ঝোপঝাড় এমনকি গাছপালা আকারে থেকে রাক্ষুসে প্রণীর আশ্রয়স্থল ও ছায়ার সৃষ্টি করতে পারে। পুকুর পাড় ও পুকুরে বিভিন্ন ধরনের আগাছা হতে পারে। যথা-

- ভাসমান ঃ কচুরী পানা, টোপাপানা, ক্ষুদিপানা, ইত্যাদি
- লতানো ঃ কলমিলতা, মালঞ্চ, হেলেঞ্চা, ইত্যাদি
- নিমজ্জিত ঃ ঝাঁঝি, নাজাস
- নির্গমণশীল ঃ শুসনি শাক, আড়াইল, ইত্যাদি।

এছাড়াও শ্যাওলাজাতীয় আগাছাও দেখা যায়।

কেন আগাছা দূর করা প্রয়োজনঃ

সব ধরনের জলজ আগাছা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মাছ ও চিংড়ি চাষে বেশ কিছু ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। যেমন:

- আগাছা মাটি ও পানির পুষ্টি পদার্থ গ্রহণ করে পুকুরের উৎপাদনশীলতা কমিয়ে দেয়।
- পানিতে সূর্যালোক প্রবেশ না করায় সালোকসংশ্লেষণ বাঁধাগ্রস্থ হয়।
- পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা কমে যায়।
- মাছ ও চিংড়ির চলাচলে ব্যাঘাত ঘটায়, রাক্ষুসে প্রাণীর শিকারে পরিণত হয়।
- শিকারী মাছ ও প্রাণীর আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে।
- পুকুর/ঘেরে প্রয়োজনে সহজে হররা টানা যায় না।
- জাল টানায় অসুবিধা সৃষ্টি করে।
- অতিরিক্ত শেওলার কারণে রাতের বেলা অক্সিজেন স্বল্পতার জন্য চিংড়ি মারা যেতে পারে।
- সারের কার্যকারিতা ব্যাহত করে।
- পুকুর/ঘেরে প্রয়োজনে সহজে হররা টানা যায় না।

চিত্র-৩: আগাছা ও ডালপালা পরিষ্কার।

দূর করার পদ্ধতি ঃ

- **কায়িক পরিশ্রমঃ** আগাছা কায়িক পরিশ্রম দ্বারা দূর করা যায়। পুকুরের যাবতীয় আগাছাকে দা, কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলে হাত দিয়ে তুলে ফেলা যায়। কখনও কখনও পুকুরে হররা বা দড়ি টেনে আগাছার শিকড় আলাদা করে পরে টেনে তুলে ফেলা যায়। তন্তুজাতীয় শেওলা দূর করার জন্য কাস্তে দিয়ে কেটে তুলে ফেললে চিংড়ির কোন অসুবিধা হয় না।
- **জৈবিক পদ্ধতিঃ** জৈবিক পদ্ধতিতে আগাছাভোজী মাছ চাষ করে আগাছা দমন করা যায়। অনেক মাছ আছে যারা জলজ আগাছা খেয়ে আগাছা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, যেমন- গ্রাস কার্প ও সরপুঁটি মাছ। এ ছাড়া মিরর কার্প ও কার্পিও মাছ ডুবন্ত উদ্ভিদের শিকড় তুলে ফেলে। ফলে তা হাত দিয়ে টেনে তুলে ফেলা যায়।

- **সার প্রয়োগ পদ্ধতি:** পুকুরে ডুবন্ত উদ্ভিদ থাকলে বেশী পরিমানে অজৈব সার প্রয়োগ করে তা দমন করা যায়। যদি পুকুওে ডুবন্ত উদ্ভিদ যেমন নাজাজ থাকে তাহলে প্রতি শতাংশ ৫০০ গ্রাম ইউরিয়া সার প্রয়োগ করলে ২-৩ দিনের মধ্যে পানির উপর সবুজ স্তরের সৃষ্টি হয় ফলে সূর্যালোক না পাওয়ার ফলে অল্প কয়েক দিনের মধ্যে সমস্ত উদ্ভিদ (নাজাজ) মারা যায়।
- **রাসায়নিক পদ্ধতি:** জলজ আগাছা দমনের জন্য যে সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হয়, সেগুলো হচ্ছে-
  - ২-৪ ডি: ১৩৮-১৮০ গ্রাম/শতাংশ - ভাসমান এবং লতানো উদ্ভিদ ধ্বংসের জন্য
  - সিমাজিন: ৩ মিঃ গ্রাঃ/লিটার - চাড়া জাতীয় উদ্ভিদ ধ্বংসের জন্য ।
  - এনডোথল: ১-৩ মিঃ গ্রাঃ/লিটার - কেশরীয় উদ্ভিদ ধ্বংসের জন্য ।
- *জলজ আগাছা নিয়ন্ত্রণে কায়িক শ্রম ও জৈবিক পদ্ধতিই সর্বাপেক্ষা ভাল পক্ষান্তরে রাসায়নিক পদ্ধতি সর্বাপেক্ষা অনুত্তম ও অনাকাঙ্খিত ।*

৫. রাক্ষুসে ও বাজে মাছ দূরীকরণ (predator and undesirable species control)

রাক্ষুসে ও বাজে মাছ কি?

যে সব মাছ অন্য মাছকে সরাসরি খেয়ে ফেলে তাদেরকে বলা হয় রাক্ষুসে মাছ বলে। যেমন: শোল, বোয়াল, চিতল, ফলি, বাইল্যা, টাকি, চ্যাং, মাগুর, কাকিলা ইত্যাদি। আর যে সব মাছ অন্য মাছকে খেতে পারে না কিন্তু অন্য মাছের সহিত খাদ্য, বাসস্থান এবং অক্সিজেন নিয়ে অন্য মাছের সাথে প্রতিযোগিতা করে তাদেরকে বাজে মাছ বা অনাকাংখিত বা অবাঞ্ছিত মাছ বলে। যেমন: মলা, ঢেলা, চেলা, চাপিলা, পুঁটি, চান্দা, ছোট ইচা, বইচা ইত্যাদি।

রাক্ষুসে ও বাজে মাছ দূর করার কারণ

চাষাবাদের পূর্বে পুকুর/ঘের থেকে রাক্ষুসে মাছ এবং বাজে মাছ সরিয়ে ফেলতে হয়। রাক্ষুসে মাছ চাষকৃত বা কাংখিত মাছকে খেয়ে ফেলে। অন্য মাছের বাসস্থান, খাবার ও অক্সিজেন নিয়ে প্রতিযোগিতা করে। ফলে নানাভাবে চাষকৃত মাছের ক্ষতি সাধিত হয়। যেমন-

- রাক্ষুসে মাছ চাষকৃত মাছ এবং চিংড়ির পোনা খেয়ে ফেলে। যেমন- রাক্ষুসে মাছ ১ কেজি বড় হতে প্রায় ১০-১২ কেজি অন্য মাছ খায়।
- বাজে মাছ চাষকৃত মাছ ও চিংড়ির খাদ্য নষ্ট করে। যেমন- ১ কেজি বাজে মাছ ১০- ১২ কেজি মাছের খাদ্যে ভাগ বসায়।
- উভয় ধরনের মাছ পুকুরে চাষকৃত মাছে রোগ জীবাণুর সংক্রমণ ঘটায়।
- চাষকৃত মাছ ও চিংড়ির সাথে খাবার, বাসস্থান ও অক্সিজেন নিয়ে প্রতিযোগীতা করে।

চিত্র-৪: রাক্ষুসে ও বাজে মাছ।

দূর করার উপায়

ক. পুকুর শুকিয়ে
খ. বিষ প্রয়োগ করে
গ বার বার জাল টেনে
ঘ. বরশি দিয়ে।

ক. পুকুর/ঘের শুকানো

বাজে পোকা-মাকড়, রাক্ষুসে ও বাজে মাছ মারার জন্য পুকুর/ঘের শুকনো সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি। এতে রাক্ষুসে মাছ কাঁদায় লুকিয়ে থাকতে পারে না। এ ক্ষেত্রে স্লুইচ গেট থাকলে তা গেট খুলে দিয়ে অথবা শ্যালো পাম্পের সাহায্যে পানি সেঁচে বেড় করে দিতে হয়। শুকানোর পর কড়া রোদে পুকুর/ঘের বেশ কদিন ফেলে রাখতে হবে। পুকুর এমনভাবে শুকিয়ে নিতে হবে যাতে মাটি অন্ততঃ ১৫ সে.মি. পর্যন্ত ফেটে যায় এবং তলা দিয়ে হেটে গেলে পায়ের দাগ পড়ে কিন্তু পা দেবে না যায়। পুকুরের তলায় অতিরিক্ত কাদা তুলে ফেলতে হবে এবং মই টেনে যতদূর সম্ভব সমান করে দিতে হবে। এ কাজটি বর্ষায় পূর্বেই ফাল্গুন/চৈত্র মাসে (ফেব্রুয়ারী- মার্চে) করলে খরচ ও সময় দুই'ই কম লাগে।

পুকুর শুকানোর উপকারীতা

- পুকুরের অবাঞ্ছিত প্রাণী নিয়ন্ত্রণ, দমন এবং মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করা যায়।
- পুকুরের, ঘেরের দূষিত জৈব ও অজৈব পদার্থকে সহজে খনিজায়ন করা যায়।
- পুকুরে বিদ্যমান বিভিন্ন জলজ আগাছা দূর কবা যায়।
- বিভিন্ন ধরনের সালফাইড দূরীভূত করা যায়।
- মাটির অম্লতা কমানো যায়।
- অনবরত চাষের ফলে মাটিতে জমা হওয়া এ্যামোনিয়া গ্যাস দূর করা যায়।
- রৌদ্রে শুকানোর মাধ্যমে মাটিতে থাকা রোগ জীবানু দূর করা যায়।
- চুন, সার সহজে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা যায়।

খ. বিষ প্রয়োগ

যে কোন কারণে পুকুর/ঘের শুকানো সম্ভব না হলে বিষ প্রয়োগে রাক্ষুসে ও বাজে মাছ দূর করা যায়। আমাদের দেশে চাষীরা বিষ হিসেবে ফসটক্সিন, রোটেনন, চা বীজের খৈল, তামাকের গুড়া, ব্লিচিং পাউডার, থায়োডিন,এনড্রিন, হিলডাল ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে। এদের মধ্যে রোটেনন বা চা বীজের খৈল ব্যতীত অন্যান্য বিষগুলো

- মাছ/চিংড়ির যকৃত ও ফুলকা ক্ষতিগ্রস্থ করে
- প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস করে
- মানব দেহের উপর দীর্ঘ মেয়াদী পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে

সে কারণে পুকুর বা ঘের হতে রাক্ষুসে ও বাজে মাছ দূরীকরণের জন্য রোটেনন বা চা বীজের খৈল ব্যতীত অন্যান্য বিষগুলো জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় প্রয়োগ কোনভাবেই অনুমোদন করা হয় না।

এ ছাড়াও এ দু'টো বিষের বিশেষ কিছু বিশেষত্ব রয়েছে। যেমন-

- রোটেনন ও চা বীজের খৈল জৈব উৎস হতে উৎপন্ন।
- এগুলো দ্বারা মৃত মাছ নিশ্চিন্তে খাওয়া যায়।
- উভয়ই জৈব সার হিসেবে কাজ করে।
- এগুলো প্রয়োগে মাছ মারা যায়, চিংড়ি ও অন্যান্য জলজ কীট মরে না।
- উভয় ধরনের বিষই মাছের ফুলকায় আক্রমন করে ফিলামেন্ট বন্ধ করে দেয়, ফলে দম বন্ধ হয়ে মাছ মারা যায়।

রোটেনন পাউডার

রোটেনন হচ্ছে ডেরিস গাছের মূল থেকে তৈরি এক ধরনের পাউডার, যা দেখতে হালকা বাদামী রঙের। রোটেনন প্রয়োগে মাছ মারা যায়, চিংড়ি ও অন্যান্য জলজ কীট মারা যায় না।

প্রয়োগমাত্রা

রোটেননের প্রয়োগমাত্রা নির্ভর করে মূলতঃ এর শক্তি ও তাপমাত্রার উপর। নীচের সারণীতে প্রতি শতাংশে এক ফুট বা ৩০ সে.মি. গভীরতার জন্য বিভিন্ন ধরনের শক্তি সম্পন্ন বিষের সুপারিশকৃত প্রয়োগমাত্রা উল্লেখ করা হলো-

সারণী-১: বিষের ব্যবহার মাত্রা

বিষের নাম	শক্তি	ব্যবহার মাত্রা/শতাংশ/ফুট গভীরতা
রোটেনন	৯.১%	১৮-২০ গ্রাম
রোটেনন	৭%	৩০-৩৫ গ্রাম
চা-বীজের খৈল		১৫০ গ্রাম
তামাকের গুড়া		১-১.৫ কিলোগ্রাম/ শতাংশ/ফুট গভীরতা

উল্লেখ্য যে পুকুর/ঘেরে রাক্ষুসে মাছ বেশী থাকলে প্রতি শতাংশে ১ ফুট গভীরতার জন্য ৯.১% শক্তিমাত্রার ৩৫ গ্রাম রোটেনন প্রয়োগ অধিক কার্যকর। আর রোটেননের ভাল কার্য়কারীতা পেতে রৌদ্রজ্জল দিনের দুপুরে প্রয়োগ করতে হয়।

রোটেনন প্রয়োগ পদ্ধতি

প্রয়োজনীয় পরিমাণ রোটেনন বালতিতে নিয়ে আস্তে আস্তে পানি মিশিয়ে প্রথমে কাঁই তৈরী করতে হবে। প্রস্তুতকৃত কাঁই তিন ভাগ করে এক ভাগ দ্বারা ছোট ছোট বল বানাতে হবে এবং বাকী দু'ভাগে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি মিশিয়ে তরল করতে হবে। প্রথমে ছোট ছোট বলগুলো সমস্ত পুকুরের পানিতে সমান ভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে এবং পাশাপাশি তরলীকৃত অংশও সমস্ত পুকুরে সমানভাবে পানিতে ছিটিয়ে দিতে হবে। ২০-২৫ মিনিট পর আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে জাল টেনে মাছ ধরে ফেলতে হবে। রোটেনন প্রয়োগের পর পানি ওলট-পালট করে দিলে বিষের কার্যকারিতা আরো বেড়ে যায়।

বিষাক্ততার মেয়াদকাল ঃ ৭-১০ দিন।

চা বীজের খৈল

এটি চায়ের উপজাত, যার মধ্যে ১০-১৫% সেপোনিন থাকে। সেপোনিন মাছ মারার জন্য কার্যকর যা রক্তের লোহিত কণিকাকে জমাট করে ফেলে। চা বীজের খৈল প্রথমে বিষ, পরে সার হিসেবে কাজ করে। মধ্যম লবণাক্ততা (১৫ পিপিটি), উচ্চতার তাপমাত্রা এবং অম্ল পানিতে এটি অধিকতর কার্যকর। চা বীজের খৈল চিংড়ির খোলস পাল্টাতে সহায়ক। চিংড়ি থাকা অবস্থায় অবাঞ্চিত মাছ দূর করার জন্য এটি দিতে হলে চিংড়ির ওজন ২ গ্রামের বেশি হওয়া উচিত। উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ি চাষে এটি অধিকতর ফলপ্রসূ বলে বিবেচিত।

চা বীজের খৈল প্রয়োগ পদ্ধতি

প্রয়োজনীয় খৈল ৩ গুন পানিতে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। ভেজানো খৈল পরিমাণমত পানি দ্বারা তরল করে সমস্ত জলাশয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে।

বিষাক্ততার মেয়াদকাল ঃ ৩-৭ দিন।

তামাকের গুড়া

তামাকের গুড়া প্রয়োগে মাছ ও শামুক মারা যায় কিন্তু চিংড়ি মরে না। এটি প্রথমে বিষ, পরে সার হিসেবে কাজ করে। এতে কাদার নিচে লুকানো প্রাণী এবং শামুকও মারা যায়।

তামাকের গুড়ার প্রয়োগ পদ্ধতি

একরাত পাত্রের মধ্যে পানিতে ভিজিয়ে রাখার পর সূর্যালোকিত সময়ে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। এটি অম্লীয় পানিতে কম গভীরতায় (২০-৩০ সে.মি) বেশি কার্যকর।

বিষাক্ততার মেয়াদকাল ঃ প্রায় ৭-১০ দিন।

বিষ প্রয়োগের সতর্কতা

- বিষ ব্যবহারের পূর্বেই শুধু পাত্রের মুখ খুলতে হবে
- বিষ বাচ্চাদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে
- বিষ ব্যবহারের পূর্বে নাকে-মুখে গামছা বেঁধে নিতে হবে
- বিষ অবশ্যই বাতাসের অনুকূলে ছিটাতে হবে

সঠিকভাবে বিষের পরিমান নির্ধারণের জন্য পানির গভীরতা খুব ভালভাবে নির্ণয় করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে পুকুরের অগভীর এবং গভীর অংশের পানির গভীরতার গড় বের করতে হবে। সাধারণভাবে পুকুরের অন্ততঃ ২০ টি স্থানের গভীরতার মাপ নেয়া উচিত।

গ. বার বার জাল টানা

পুকুর/ঘের শুকানো বা বিষ প্রয়োগ করা সম্ভব না হলে খুব ভালভাবে জাল টেনেও রাক্ষুসে মাছ ও আমাছা (বাজে মাছ) দূর করা যায়। ছোট এবং কম গভীর পুকুর/ঘেরে জাল টেনে রাক্ষুসে ও বাজে মাছ অনেকাংশে দূর করা যেতে পারে। তবে তুলনামূলকভাবে বড় এবং বেশী গভীর পুকুর/ঘেরে জাল টেনে রাক্ষুসে ও বাজে মাছ দূর করা খুব কঠিন। সে কারণে পুকুর/ঘেরে জাল টেনে রাক্ষুসে মাছ দমন খুব একটা কার্যকর নয়।

ঘ. বরশি ব্যবহার

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বরশি দিয়েও রাক্ষুসে মাছ কমিয়ে ফেলা যায়। পুকুরে মাছ থাকা অবস্থায় রাক্ষুসে মাছ প্রবেশ করলে টোপসহ বরশি দিলে রাক্ষুসে মাছ সহজে আকৃষ্ট হয়ে আটকে যায়। তবে এ পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ রাক্ষুসে মাছ নির্মূল নাও হতে পারে। কেবল ব্যপকতা কমানো যেতে পারে।

পদ্ধতি নির্বাচনে সতর্কতা

রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দূর করার পদ্ধতি নির্বাচনে নিম্নলিখিত বিষয়ের ওপর নজর রাখা প্রয়োজন-

- পুকুরে বিষ ব্যবহার করা হলে ঔষধ প্রাপ্যতা, মূল্য, বিষাক্ততার মেয়াদকাল, পুকুরের সামাজিক ব্যবহার, জনস্বাস্থ্যের ওপর প্রতিক্রিয়া -এ ৫টি বিষয় খুব ভালভাবে বিচার করতে হবে।
- পুকুর শুকানোর আগেই পানির বিকল্প উৎস (গভীর/অগভীর নলকূপ) সম্পর্কটি বিবেচনায় রাখা উচিত।
- এমন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত নয় যা আর্থিক, সামাজিক অথবা উৎপাদন সময়ের দিক থেকে ক্ষতিকর।

৬. চুন প্রয়োগ (liming)

চুনের প্রকারভেদ

বাজারে বিভিন্ন ধরনের চুন পাওয়া যায়। নিম্নের সারণীতে তাদের নাম ও রাসায়নিক গঠন উল্লেখ করা হলো-

সারণী-২: বিভিন্ন প্রকার চুনের নাম ও রাসায়নিক গঠন

চুনের নাম	রাসায়নিক গঠন
পাথুরেচুন	$CaCO_3$
পোড়া চুন	CaO
কলিচুন	$Ca(OH)_2$
ডলোমাইট	$CaMg(CO_3)_2$
জিপসাম	$CaSO_4,2H_2O$

চুন প্রয়োগর উপকারিতা

১. চুন হাইড্রোজেন ও হাইড্রোক্সিল আয়নের ভারসাম্য বজায় রাখতে অর্থাৎ pH কে নিরপেক্ষ রাখতে সহায়তা করে যার ফলে প্লাংকটনের বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় পরিবেশ সংরক্ষিত থাকে।
২. প্লাংকটনের বৃদ্ধির জন্যে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও গুরুত্বপূর্ণ আয়নসমূহ প্রদান করে থাকে। ক্যালসিয়াম ও সিলিকা জীবের দৈহিক কাঠামো গঠনে সহায়তা করে থাকে।
৩. সালোকসংশ্লেষণের জন্যে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সরবরাহ বাড়ায়।
৪. প্লাংকটনের বৃদ্ধির জন্যে কাদায় আবদ্ধ ফসফরাসকে মুক্ত করে দেয়।
৫. জৈব পদার্থের পঁচন ক্রিয়া তরান্বিত করে ফলে পানিতে পুষ্টি সরবরাহ বৃদ্ধি পায়।
৬. পরজীবি ও ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে।
৭. পানির ঘোলাত্ব দূর করে।
৮. সারের কার্যকারীতা বৃদ্ধি করে।

চুন প্রয়োগের মাত্রা

মাটির পিএইচ ও চুনের ধরনের উপর নির্ভর করেই কেবল মাত্র চুনের মাত্রা নির্ধারণ করা উচিত। যখন শুধুমাত্র পিএইচ কে বিবেচনা করে চুনের মাত্রা নির্ধারণ করা হয় সে ক্ষেত্রে পোড়া চুন পাথুরে চুনের চেয়ে দ্বিগুন ও কলি চুন থেকে দেড়গুণ শক্তিশালী ধরে মাত্রা নির্ধারণ করা হয় বলে পোড়াচুন পরিমাণে কম লাগে। নিম্নের সারণীতে শতাংশ প্রতি চুনের মাত্রার একটি নির্দেশনা দেয়া হলো-

সারণী-৩: পিএইচ মাটির ধরণ অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার চুনের প্রতি শতাংশের প্রয়োগমাত্রা

পিএইচ	পোড়াচুন	কলিচুন	পাথুরে চুন	ডলোমাইট
৫-৬ (এটেল মাটি)	৪ কেজি	৬ কেজি	৮ কেজি	৮-৯ কেজি
৬-৭ (দোআঁশ মাটি)	১-২ কেজি	৩ কেজি	৪ কেজি	৩-৪ কেজি

সারণী-৪: মাটির ধরণ অনুযায়ী নতুন ও পুরাতন পুকুরে পোড়াচুনের প্রতি শতাংশের প্রয়োগমাত্রা

মাটির ধরণ	নতুন পুকুর/ঘের	পুরাতন পুকুর/ঘের
দোআঁশ মাটি	১ কেজি	২ কেজি
এটেল মাটি	৪ কেজি	৬ কেজি

চুন প্রয়োগ পদ্ধতি

শুকনা ও ভেজা মাটির পুকর/ঘেরে প্রস্তুত কালীন সময়ে প্রয়োজনীয় চুন গুড়া করে ঢালসহ সমস্ত জায়গায় সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। পানি ভর্তি পুকুরে প্রয়োজনীয় চুন মাটির চাড়ি বা ড্রামে গুলিয়ে ঢালসহ সমস্ত পুকুরে পূর্বের মত সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

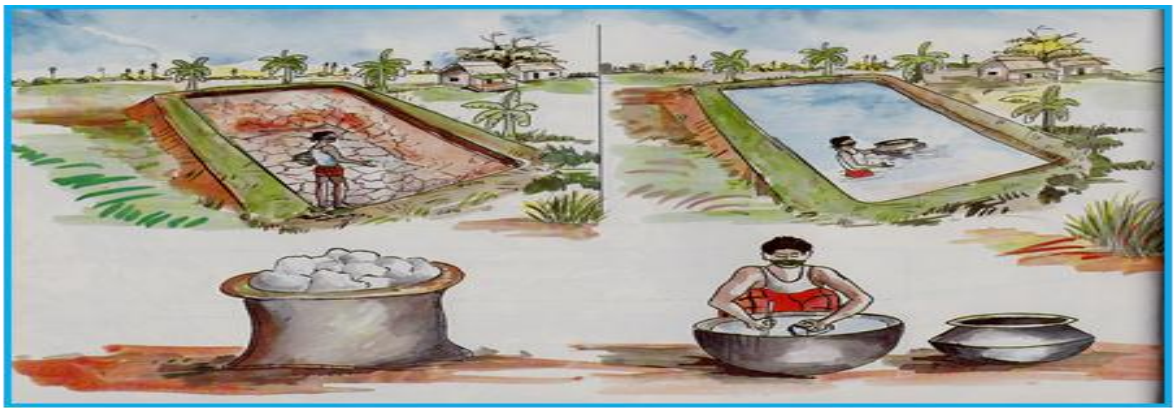

চিত্র-৫: চুন প্রয়োগ

চুন প্রয়োগের সময়

চুন সবসময় রৌদ্রজ্জোল দিনের সকালে প্রয়োগ করা উত্তম। পুকুরের চাষকালীন অবস্থাভেদে চুন প্রয়োগের সময় নিম্নের সারণীতে উল্লেখ করা হলো।

সারণী-৫: চুন প্রয়োগের সময়

পুকুর/ঘেরের ধরণ	চুন প্রয়োগের সময়
• শুকনা পুকুর/ঘেরে	চাষ দেয়ার ১-২ দিন পর
• মাটি ভেজা পুকুর/ঘেরে	পানি সেঁচের ১-২ দিন পর
• পানি ভর্তি পুকুর/ঘেরে	সার প্রয়োগের ৬-৭ দিন আগে

চুন প্রয়োগে সতকর্তা

১. চুন গুলানো ও ছিটানোর সময় নাক-মুখ গামছা দিয়ে বাঁধতে হবে
২. কোন অবস্থাতেই প্লাষ্টিকের পাত্রে চুন গুলানো যাবে না
৩. চুনের পাত্রে পানি ঢালার আগে পাত্রে চুন রেখে পাত্রের মুখ অবশ্যই চট/বস্তা দিয়ে ঢাকতে হবে
৪. তারপর সাবধানে পানি ঢালতে হবে যেন ফুটন্ত চুন চোখে-মুখে না লাগে।
৫. বাতাসের অনুকূলে চুন ছিটাতে হবে
৬. চোখে চুন লাগলে পরিস্কার পানি দিয়ে সাথে সাথে ধুয়ে ফেলতে হবে |

অভিজ্ঞতালব্ধ পরামর্শ

১. এলাকায় অম্লত্বের সমস্যা না থাকলে পুকুর/ঘের প্রস্তুতকালীন সময়ে সুপারিশকৃত মাত্রার সব চেয়ে কম পরিমাণ চুন প্রয়োগ করতে হবে। তবে প্রয়েজনীয় সার প্রয়োগের পরেও যদি পানিতে পর্যাপ্ত শেওলা তৈরী না হয় তা হলে অতিরিক্ত চুন প্রয়াগ করতে হবে।
২. যদি অম্লীয় মাটির সমস্যা থাকে তাহলে উত্তম হলো মাটির পিএইচ পরীক্ষা করা। তা যদি সম্ভব না হয় তবে সুপারিশকৃত মাত্রার সর্বোচ্চ পরিমাণ প্রয়োগ করা। এ ক্ষেত্রে খরচের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।
৩. কসযুক্ত কালচে বা লালচে মাটি বা এসিড সালফেট যুক্ত মাটির ক্ষেত্রে চুনের স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে ২-৩ গুণ বেশী চুন প্রযোগ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে পাথুরে চুন ও ডলোমাইট উভয়ই বেশ কার্যকর।

৭.সার প্রয়োগ (fertilization)

সার প্রয়োগের উদ্দেশ্য

মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই পুকুরের পানিতে সার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। আর প্রাকৃতিক খাদ্য অর্থাৎ উদ্ভিদকণার প্রাচুর্যের ওপরই পানিতে মাছের শ্বাসকার্যের জন্য অতি প্রয়োজনীয় দ্রবীভূত অক্সিজেন এর প্রাপ্যতা নির্ভরশীল। মাছের প্রাকৃতিক খাবার হলো প্রধানত উদ্ভিদকণা ও প্রাণিকণা। প্রাণিকণার উৎপাদন নির্ভর করে উদ্ভিদকণার প্রাচুর্যের ওপর। আর উদ্ভিদকণা তাদের বাঁচার জন্য পানিতে দ্রবীভূত পুষ্টির ওপর নির্ভরশীল। উদ্ভিদ ও প্রাণিকণা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম ও কার্বন। প্রাকৃতিকভাবে বিভিন্ন উৎস হতে এই পুষ্টি উপাদানসমূহ পানিতে দ্রবীভূত হয়। তবে এদের মধ্যে নাইট্রোজেন ও ফসফরাস প্রাকৃতিকভাবে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানিতে দ্রবীভূত হয় না, ফলে যখন পুকুরে মাছের পোনা মজুদ হয় তখন অধিক পরিমাণে উদ্ভিদকণা ও প্রাণিকণা উৎপাদনের প্রয়োজন হয়। সে সময় পানিতে দ্রবীভূত নাইট্রোজেন ও ফরফরাসের ঘাটতি দেখা দেয়। পুষ্টি পদার্থের এই ঘাটতি পূরণের জন্য পুকুরে বিশেষভাবে নাইট্রোজেনের উৎস হিসেবে ইউরিয়া এবং ফরফরাসের উৎস হিসেবে টিএসপি সার প্রয়োগ করা হয়।

সারের প্রকারভেদ

সার দু রকমের হয়ে থাকে। জৈব ও অজৈব। পুকুরে দু ধরনের সারই প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

জৈব সার

সরাসরি প্রাণিকণা এবং ব্যাক্টেরিয়ার খাদ্য হিসেবে জৈব সার কাজ করে এবং পানিতে অজৈব পুষ্টি মুক্ত করে উদ্ভিদকণা উৎপাদনে সাহায্য করে। পুকুরে জৈব সার হিসেবে গোবর, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা অথবা কম্পোস্ট ব্যবহার করা যেতে পারে।

অজৈব সার

এটি প্রাথমিকভাবে উদ্ভিদকণা উৎপাদনে সহায়ক বা প্রাণিকণা বিস্তারকে ত্বরান্বিত করে। অজৈব সার হিসাবে প্রধানত ইউরিয়া ও টিএসপি ব্যবহার করা হয়।

নিচের সারণিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদকণা ও প্রাণিকণা উৎপাদনে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের সারে বিদ্যমান নাইট্রোজেন, ফরফরাস ও পটাশিয়ামের পরিমাণ উল্লেখ করা হলো-

সারণী-৬: বিভিন্ন ধরনের সারে বিদ্যমান পুষ্টি উপাদান

পুষ্টি	ইউরিয়া (%)	টিএসপি (%)	কম্পোস্ট (%)
নাইট্রোজেন	৪৩-৪৬	-	২-৩
ফসফরাস	-	৪০-৪৫	১-২
পটাশিয়াম	-	-	৩-৪

জৈব ও অজৈব সার ব্যবহারের সুবিধা-অসুবিধা

জৈব সারের সুবিধা

- সরাসরি প্রাণিকণা ও ব্যাক্টেরিয়ার খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়
- বেলে ও দো-আঁশ মাটির পুকুরে পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে
- মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়, তলদেশে মাছের খাদ্য (বিভিন্ন পোকা-মাকড়, লার্ভা, ইত্যাদি) জন্মে
- স্থানীয়ভাবে কম খরচে/বিনা খরচে প্রাপ্য
- পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কম
- প্রাণিকণার বৃদ্ধির জন্য কম-বেশি সব ধরনের পুষ্টি বিদ্যমান
- সারের আঁশ ব্যাক্টেরিয়ার আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে।

জৈব সারের অসুবিধা

- পরজীবী ও রোগের বাহকের জন্য দায়ী থাকে
- যৌগ পদার্থ হওয়ার কারণে দেরিতে ফলাফল পাওয়া যায়
- তলায় জমা হয়ে বিষাক্ত গ্যাসের সৃষ্টি করতে পারে
- অধিক পরিমাণে প্রয়োজন হয় বলে প্রয়োগ পদ্ধতি কিছুটা জটিল
- ক্ষেত্র বিশেষে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়।

অজৈব সারের সুবিধা

- দ্রুত কার্যকর
- বাজারে সহজ প্রাপ্য
- নির্দিষ্ট মাত্রার পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ
- প্রয়োগ পদ্ধতি সহজ।

অজৈব সারের অসুবিধা

- কার্যকারিতা ক্ষণস্থায়ী
- মাটির গঠন শক্ত হয়ে যায়
- মাটির অণূবীজের কার্যকারিতা কমে যায়
- বহু দিন ধরে ব্যবহার করলে আস্তে আস্তে পুকুরের উৎপাদনশীলতা কমে যায়
- অপরিমিত ব্যবহারে রোগের আক্রমণ বৃদ্ধি পায়।

সার প্রয়োগের মাত্রা

পুকুরে সার প্রয়োগের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মজুদকৃত মাছের জন্য প্রাথমিক খাদ্য উৎপাদন। পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রাথমিক উৎপাদনের জন্য একটি পুকুরে কী পরিমাণ সার প্রয়োগ করতে হবে তা অনেকগুলো বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। যেমন-

- মাটির অবস্থা
- পানির মধ্যকার শেওলার পুষ্টি চাহিদা
- পরিবেশের অবস্থা (তাপমাত্রা, মেঘ-বৃষ্টি)
- সারের গুণাগুণ
- সারের প্রাপ্যতা।

এছাড়া পুকুরের উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে চাষির অভিজ্ঞতা ও সারের প্রয়োগ মাত্রা নির্ধারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
সাধারণভাবে একটি পুকুরে পোনা মাছ মজুদপূর্বক বা মজুদের জন্য প্রস্তুতকালীন সারের সুপারিশকৃত মাত্রা নিম্নরূপ ঃ

সারণী-৭: বিভিন্ন ধরনের সারের প্রয়োগমাত্রা

সার	প্রয়োগমাত্রা/শতাংশ	
জৈব ও অজৈব সার	সাধারণ পরিমাপক	স্থানীয় পরিমাপক
কম্পোস্ট	৮-১০ কেজি	প্রায় এক ঝুড়ি
ইউরিয়া	১০০-১৫০ গ্রাম	৩-৫ মুঠ
*টিএসপি**	৫০-৭৫ গ্রাম	১-২ মুঠ

*টিএসপি সারের পরিবর্তে ডিএপি সার ব্যবহার করলে ইউরিয়ার প্রয়োগমাত্রা অর্ধেক হবে।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

শুকনা পুকুর ঃ তলদেশ, ঢাল, পাড়, ইত্যাদি সংস্কারের জন্য পানি সেচ দেয়া পুকুরে পানি প্রবেশ করানোর সুবিধা থাকলে অথবা যদি না থাকে তবে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ দিকে ভারিবর্ষণ হবে, এ সম্ভাবনায় প্রয়োজনীয় পরিমাণ জৈব সার সমানভাবে তলায় ছড়িয়ে দেয়ার পর চাষ দিয়ে ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। তবে শুকানোর পর তলায় একটি গর্ত খুঁড়লে যদি দেখা যায় মাটি হতে অতিরিক্ত লাল কষ বের হয় তবে চাষ না দেয়াই ভাল। প্রয়োজনে উপযুক্ত মাত্রার জৈব সারের সাথে কিছু সরিষার খৈল (০.৫ কেজি/শতাংশ) মিশিয়ে দেয়া যায়। পানি ভরাটের পর টিএসপি সার ১২-২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে পানি মিশ্রিত সার ছিটানোর পূর্বে ইউরিয়ার সাথে একত্রে পানিতে গুলে সমস্ড় সারের মিশ্রণ পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।

পানি ভর্তি পুকুর ঃ টিএসপি ও গোবর সার একত্রে একটি বালতি বা ড্রামের মধ্যে তিনগুণ পানিতে ১২-২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে এবং ভালভাবে মিশ্রণের ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রয়োগের পূর্বে এগুলোর সাথে ইউরিয়া ভালভাবে মিশিয়ে সারা পুকুরে সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। তবে পুকুরের আয়তন খুব বড় হলে জৈব সার পানিতে গুলে প্রয়োগ করা বেশ অসুবিধাজনক। সে ক্ষেত্রে জৈব সার শুকনা অবস্থায় সতর্কতার সাথে একত্রে সমানভাবে ছিটিয়ে দেয়া যেতে পারে।

সার প্রয়োগের সময়

চুন প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর এবং পোনা মজুদের ৮-১০ দিন আগে পুকুরে প্রস্তুতকালীন সার প্রয়োগ করতে হবে। দিনের যে কোন সময় সার প্রয়োগ করা গেলেও সাধারণত পুকুরের পানিতে সূর্যালোক পড়ার পর সার প্রয়োগ করাই উত্তম। এই সময়টি সকাল থেকে দুপুরের মধ্যেই নির্ধারণ করা উচিত।

সার প্রয়োগের সতর্কতা

- অম্লীয় মাটিতে সারের কার্যকারীতা কম হয়। অধিক বা কম পিএইচ-এ ফসফরাস দ্রুত তলানী পড়ে।
- ঘোলা পানিতে সারের কার্যকারীতা কম হয়ে থাকে।
- পানিতে জলজ উদ্ভিদ থাকলে সারের কার্যকারীতা কম হয়। কারণ সারের পুষ্টিকর পদার্থ ফাইটোপ্লাংকটনের চেয়ে আগাছাই বেশী গ্রহন করে থাকে।
- পুকুরে পানির স্থায়ীত্ব তিন সপ্তাহের কম হলে সারের কার্যকারিতা কম হবে।
- গভীর পানিতে ফসফরাস কাদায় তলানী হিসাবে আবদ্ধ থাকে ফলে এর কার্যকারীতা কমে যায়।
- মিশ্র সার ব্যবহারের পূর্বে পরিমিত পানিতে খুব ভালভাবে গুলে নিলে কার্যকারিতা বেশী হবে।
- মেঘলা দিন বা বৃষ্টির মধ্যে সার প্রয়োগ করলে কার্যকারিতা কম হয়ে থাকে।
- ইউরিয়া সার বাতাসে খোলা অবস্থায় রাখলে কার্যকারিতা কমে যায়।

কম্পোস্ট তৈরি

কম্পোস্ট কী?

কম্পোস্ট জৈব বা উদ্ভিদজাত পচা পদার্থ। পচনকারী অণুজীবসমূহ জৈব ও সবুজ উদ্ভিদের মিশ্রণকে পচিয়ে হিউমাস জাতীয় পদার্থে পরিণত করে। এর সার মাটি ও পানিতে প্রয়োজনীয় পুষ্টি পদার্থ সরবরাহের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বাড়ায়।

গুরুত্ব

বাংলাদেশে বর্তমানে গোবরের পরিমাণে ঘাটতি রয়েছে। গোবরের ব্যবহার বহুমুখী। এ কারণে চাষীরা পুকুরে গোবর ব্যবহারের তুলনায় জ্বালানি হিসেবে বা কৃষি জমিতে প্রয়োগকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তাই চাষিদের গোবরের বিকল্প হিসেবে কম্পোস্ট সার প্রস্তুত ও ব্যবহারের বিষয়ে উৎসাহিত করা যেতে পারে। বাড়ির জমানো উচ্ছিষ্ট, লতা-পাতা দিয়েও কম্পোষ্ট সার তৈরি করা যেতে পারে।

কম্পোস্টের ধরন

প্রস্তুত প্রণালীর ওপর ভিত্তি করে কম্পোস্টকে দু ভাবে ভাগ করা যায় ঃ

১। অবায়বীয় অবস্থায় গর্তে প্রস্তুতকরণ/গর্ত পদ্ধতি

২। বায়বীয় অবস্থায় খোলা জায়গায় প্রস্তুতকরণ/খোলা বা বানা পদ্ধতি।

কম্পোস্ট তৈরির পদ্ধতি

গর্ত পদ্ধতি

পুকুর পাড়ে বা পুকুরের নিকটবর্তী ছায়াযুক্ত বা স্যাঁতসেঁতে জায়গায় এ পদ্ধতিতে অক্সিজেনবিহীন অবস্থায় কম্পোস্ট তৈরি করা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিটি ঝামেলাযুক্ত, তবে সঠিক মাত্রায় প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করা যায়। উষ্ণতা ও আর্দ্রতার ওপর নির্ভর করে ১-২ মাস লাগে। এ ধরনের কম্পোস্টকে পীট (Pit) কম্পোস্টও বলা হয়। সাধারণ পুকুর পাড়ে ছায়াযুক্ত স্থানে কম্পোস্ট তৈরির গর্ত নির্মান করা ভাল।

খোলা পদ্ধতি

খোলা জায়গা বা পুকুরের ভেতরের কোনায় বা পাড়ের কাছাকাছি অল্প পানিতে বানা স্থাপন করে এ ধরনের কম্পোস্ট তৈরি করা হয়। পদ্ধতিটি সহজ, তার অনেক সময় এর কার্যকারিতার সঠিকতা থাকে না।

গর্তে (Pit) কম্পোস্ট তৈরির প্রণালী

ক) গর্ত (Pit) তৈরিঃ এক শতাংশ পুকুরের আয়তনের জন্য ৪ ঘনফুট গর্তের প্রয়োজন। গর্তটি অবশ্যই ৪ ফুট গভির হতে হবে। পানির আয়তনকে (শতাংশ) ৪ দ্বারা গুণ করলেই ঐ পুকুরের জন্য প্রয়োজনীয় কম্পোস্টের গর্তের মাপ পাওয়া যাবে। যেমন ঃ একটি ২০ শতাংশ পুকুরের জন্য গর্তের মাপ হবে ৮০ ঘনফুট। অর্থাৎ গর্তের দৈর্ঘ্য× প্রস্থ × গভীরতা হবে- ৫ × ৪ × ৪ = ৮০ ঘনফুট।

খ) প্রয়োজনীয় উপাদানের মাত্রা ও পরিমাণ ঃ

সারণী-৮ঃ গর্তে কম্পোষ্ট সার তৈরির উপাদানসমূহ মিশ্রণের পরিমাণ

উপাদান	মিশ্রণের হার	পরিমাণ
কচুরিপানা, নরম সবুজ উদ্ভিদ বা পচা খড়	৪৯%	৩৪ কেজি
গোবর	৪৯%	৩৪ কেজি
ইউরিয়া	২%	২ কেজি (প্রায়)

শতাংশ প্রতি পানির আয়তনে ১ বছরের জন্য কম্পোস্টের উপাদানের মোট পরিমাণ প্রায় ৭০ কেজি।

গ) উপাদানগুলো গর্তে সাজানো

প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো সমানভাবে ৪ বা ৫ ভাগ করে নিতে হবে। ছোট আকারে কাটা কচুরিপানা, নরম গোবর, একভাগ ইউরিয়া স্তরে স্তরে সাজাতে হবে। অনুরূপভাবে ৪ বা ৫ স্তরে সাজিয়ে উপরে কলার পাতা বা পলিথিন দিয়ে ঢেকে, ২-৩ ইঞ্চি পরিমাণ মাটির আবরণ দিতে হবে।

সাধারণ বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- গর্তে কম্পোস্টের উপাদানগুলো গ্রীষ্মে বা বর্ষায় ভরাট করা উচিত। এতে সময় কম লাগে।
- এক সাথে এক বছরের কম্পোস্ট তৈরি করাই উত্তম।
- শুষ্ক মৌসুমে মাঝে মাঝে গর্তের উপর পানি ছিটাতে হবে।
- প্রস্তুতকৃত কম্পোস্টের রং কালচে বাদামী বা ছাই রঙের হয়ে থাকে।

খোলা পদ্ধতিতে কম্পোস্ট তৈরি

পুকুরের এক কোনায় বা পাড়ের কাছে অল্প পানিতে বানা স্থাপন করে তাতে ছোট আকারে কাটা ও অল্প শুকানো কচুরিপানা বা নরম উদ্ভিদ, গোবর ও ইউরিয়া এক সাথে পচানো হয়।

ক) কম্পোস্ট তৈরির স্থান

০.২৫ বর্গমিটার/শতাংশ পুকুরের আয়তনের জন্য জায়গা প্রয়োজন। জায়গা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা দিতে হবে। বেড়া বা বানাটির মাঝে ফাঁক বা ফোকড় এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে মাছ সহজেই কম্পোস্ট তৈরির স্থানে যাতায়াত করতে পারে।

খ) প্রয়োজনীয় উপাদান ও পরিমাণ

সারণী-৯: খোলা পদ্ধতিতে কম্পোষ্ট সার তৈরির উপাদানসমূহ মিশ্রণের পরিমাণ

উপাদান	মাত্রা	পরিমাণ
কচুরিপানা, নরম সবুজ উদ্ভিদ বা পঁচা খড়	৮৮%	৬২ কেজি
গোবর	১০%	৭কেজি
ইউরিয়া	২%	১ কেজি (প্রায়)

শতাংশ প্রতি পানির আয়তন ১ বছরের জন্যে কম্পোস্টের উপাদান মোট পরিমাণ প্রায় ৭০ কেজি।

গ) প্রস্তুত প্রণালী

প্রথমেই প্রয়োজনীয় পরিমাণ কচুরিপানা বা সবুজ উদ্ভিদকে ছোট ছোট করে কেটে, কমপক্ষে ৬ ঘন্টা রোদে শুকিয়ে, উল্লেখিত হারে গোবর ও ইউরিয়াসহ বেড়া ঘেরা স্থানে রাখতে হবে। পচন ক্রিয়া শুরু হবার সাথে সাথে লাঠি দ্বারা ভালভাবে ওলট-পালট করে দিতে হবে। এ কাজটি প্রতিদিন করতে হবে। কারণ এ পদ্ধতিতে কম্পোস্ট তৈরির জন্য পরিমিত পরিমাণ অক্সিজেনের প্রয়োজন। কোন কারণে পানির গভীরতা কমে গেলে বা বেড়ে গেলে কম্পোস্ট ও বানা নিচে বা উপরে নামিয়ে বা উঠিয়ে দিতে হবে। তবে কম্পোস্টকে কখনোই শুকাতে দেয়া যাবে না। দুই মাসের কম্পোস্টের পরিমাণ হিসাব করে প্রতিবার খোলা বা বানা কম্পোস্ট তৈরি করা ভাল।

বিশেষ বিবেচ্য বিষয়

- লাঠি দ্বারা ভালভাবে কম্পোস্টকে ওলট-পালট করে দিতে হবে।
- পানির রং ঘন সবুজ হয়ে যেতে পারে, সে ক্ষেত্রে তা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- দুই মাসের কম্পোস্টের পরিমাণ হিসাব করে প্রতিবার খোলা বা বানা কম্পোস্ট তৈরি করা ভাল।
- কম্পোস্ট শুকাতে দেয়া যাবে না।

৮. পোনা প্রাপ্তির চুক্তি (fry collection)

সঠিক সময়ে বিভিন্ন জাতের ভাল পোনা পাওয়ার জন্য ব্যক্তিগতভাবে পোনাওয়ালাদের সাথে বা পোনা উৎপাদনকারী খামারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। সার প্রয়োগের সময় ঠিক রাখার জন্য পুকুর প্রস্তুতির কাজ শুরু করার সাথে সাথেই যোগাযোগ করতে হবে।

৯. পানির প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা (Testing natural plankton's productivity)

চুন প্রয়োগের ৫-৭ দিনের মধ্যেই পুকুরে স্বাভাবিকভাবে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরী হয়ে যায়। গলদা চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে সার প্রয়োগ করাকে, বিশেষত: জৈব সার প্রয়োগ অনুৎসাহিত করা হয়। পিএল/জুভেনাইল মজুদের আগেই উৎপাদন পুকুর/ঘেরের প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা করতে হয়। পুকুর/ ঘেরের পানির রং সবুজাভ, বাদামী সবুজ, লালচে সবুজ বা হালকা বাদামী হলে বুঝতে হবে পুকুরের পানি পিএল বা জুভেনাইল ছাড়ার উপযোগী। কারণ এ সমস্ত রংয়ের পানিতে মাছ ও চিংড়ির খাদ্য প্রচুর পরিমাণে ফাইটো প্লাংকটন ও জু'প্লাংকটন উপস্থিত থাকে। আবার ঘন সবুজ, তামাটে লাল বা পরিস্কার রং এর পানি মাছ ও চিংড়ি চাষের জন্যে ভাল নয়।

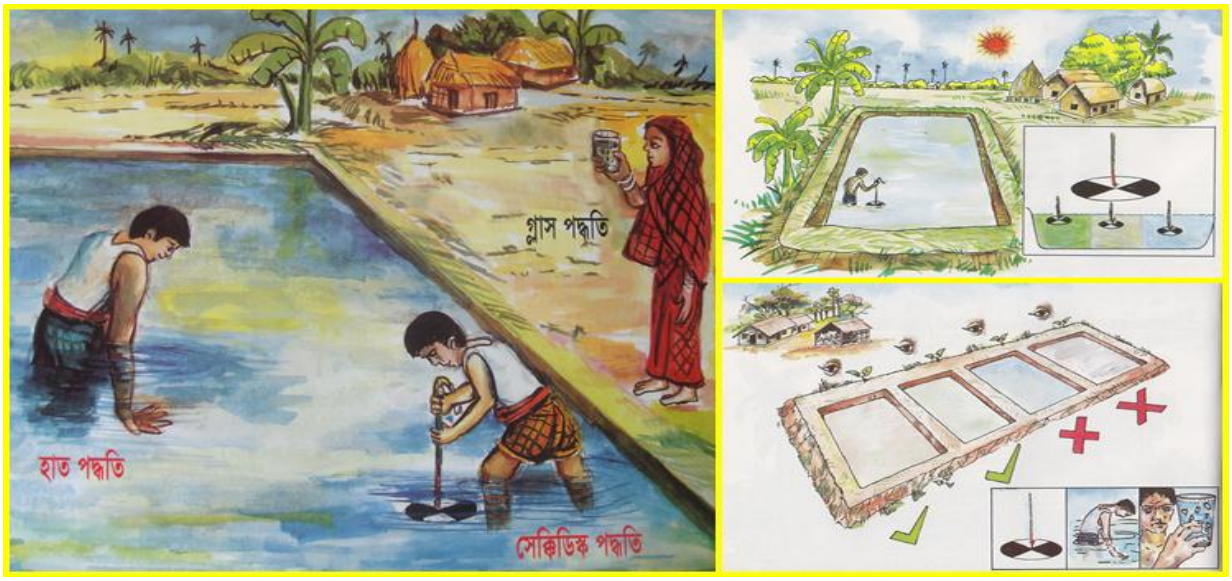

চিত্র-৬: পানির প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা

পানিতে পরিমিত খাদ্য আছে কি না তা প্রথমেই খালি চোখে পুকুর/ঘেরের পাড়ে দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বুঝে নিতে হবে। এ ছাড়াও নিম্নে উল্লেখিত পরীক্ষাগুলোর দ্বারা পানিতে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য পরিমাপ করা যেতে পারে-

ক. সেকিডিস্ক পদ্ধতি

সেকিডিস্ক একটি লোহার চাকতি বিশেষ। এর ব্যাস ২০ সেমি, রং সাদা কালো। এটি তিন রংয়ের সুতা দ্বারা ঝুলানো থাকে। সুতরাং গোড়া থেকে প্রথম ২৫ সেমি লাল, দ্বিতীয় ১০ সেমি সবুজ বাকী অংশ সাদা (১০০-১২০ সেমি)।
ব্যবহার সময়: এটি ব্যবহার করতে হবে প্রস্তুতকালীন সার প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর সকাল ১০-১১ টায়। একই ব্যক্তি একই স্থানে এটি ব্যবহার করবেন। সূর্যের অবস্থানের বিপরীতে দাঁড়িয়ে এটি ব্যবহার করা উচিত।

ব্যবহার কৌশল

পানিতে ডুবানোর পর সেকিডিস্কের সাদা–কালো অংশের দৃশ্যমানতার ওপর ভিত্তি করে পুকুরে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্যের পর্যাপ্ততা পরীক্ষা করা যায়। নিম্নে সেকিডিস্ক রিডিং–এর মাধ্যমে পুকুরে বিদ্যমান প্রাকৃতিক খাদ্যের পর্যাপ্ততা নিরূপণের একটি সারণী দেয়া হলো।

সারণী-১০: সেকিডিস্ক ব্যবহার করে প্রাকৃতিক খাদ্য পর্যবেক্ষণ কৌশল

সেকিডিস্ক রিডিং	প্রাকৃতিক খাদ্যের পর্যাপ্ততা
২৫ সে.মি.র কম	এটা যদি উদ্ভিদ/প্রাণিপ্লাঙ্কটনের জন্য হয়ে থাকে তাহলে পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি। এরূপ অবস্থার জন্য পুকুরে দ্রবীভূত অক্সিজেনের সঙ্কট দেখা দিতে পারে । এ অবস্থায় পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য কিংবা সার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে। আর যদি পানিতে দ্রবীভূত মাটি, কাঁদা ইত্যাদির মিশ্রণের ফলে এটা হয়ে থাকে তাহলে পুকুর খুবই কম উৎপাদনশীল হবে। পুকুরে পানি ঘোলা হলেও এরূপ অবস্থা হতে পারে।
২৫-৩৫ সে.মি.	যদি উদ্ভিদ/প্রাণিপ্লাঙ্কটনের উপস্থিতির জন্য এ রিডিং পাওয়া যায় তাহলে পুকুরটি মাছ চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী।
৩৫-৪৫ সে.মি.	পুকুরের ঘোলাত্ব অপর্যাপ্ত, অথবা পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের পরিমাণ কমতে শুরু করেছে।
৪৫-৬০ সে.মি.	উদ্ভিদ/প্রাণিপ্লাঙ্কটনের পরিমাণ অনেক কম। সার প্রয়োগ জরুরী।
৬০ সে.মি.র অধিক	পুকুরের পানি অতিরিক্ত পরিষ্কার। উৎপাদনশীলতা অত্যন্ত কম। পুকুরের ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন ।

চিত্র-৭: সেকিডিস্কের সাহায্যে প্রাকৃতিক খাদ্য পরিমাপ

সতর্কতা

- একই ব্যক্তি কর্তৃক একই সময়ে খাদ্য পরিমাপ করতে পারলে ভাল।
- ঘোলা পানিতে বা মেঘাচ্ছন্ন দিনে সেকিডিস্ক ব্যবহার করা যাবে না।
- সেকিডিস্ক রিডিং সঠিক ভাবে নিতে হবে।
- সেকিডিস্কের লাল ও সবুজ সুতার দৈর্ঘ্য সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হবে।

খ. গামছা গ্লাস পদ্ধতি

ঘের/পুকুরে প্রস্তুতকালীন সার প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর গামছার সাহায্যে পানি সংগ্রহ করে পরিস্কার কাঁচের গ্লাসে নিতে হবে। সূর্যের আলোতে যদি গ্লাসের মধ্যে সবুজ কণা, ক্ষুদ্র প্রাণীকণা (গ্লাস প্রতি ৫-১০টি) দেখা যায়, তবে বুঝতে হবে প্রাকৃতিক খাদ্য আছে। রঙ্গিন, ছাপমারা অস্বচ্ছ গ্লাস অথবা ঘোলা পানিতে ফলাফল বুঝা যাবে না।

গ. হাত পদ্ধতি

নিজের হাত কনুই পর্যন্ত পানিতে ডুবানোর পর, হাতের তালু/পাতা দেখতে হবে। পানির রং সবুজাভ থাকলে এবং হাতের তালু দেখা না গেলে বুঝতে হবে পরিমিত খাদ্য আছে। ছোট/খাট হাত অথবা কালো রং এর হাতে সঠিক ফল পাওয়া যাবে না। হাতের তালু ফর্সা হওয়া উচিত।

১০. পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা (Testing toxicity of water)

পোনা ছাড়ার অন্তত: একদিন আগে পুকুরের পানির বিষাক্ততা দূর হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করতে হয় কেননা পানিতে বিষক্রিয়া থাকলে পোনা মারা যাবে।

বিষাক্ততা পরীক্ষা পদ্ধতি

- হাড়ি বা পুকুরে হাপা স্থাপন করে কিছু পোনা ছেড়ে ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত দেখা।
- পোনা মারা গেলে বুঝতে হবে পানিতে বিষ ক্রিয়া রয়েছে, এ অবস্থায় পুকুরে পোনা না ছাড়া।
- কিছু দিন অপেক্ষা করার পর আবারও বিষাক্ততা পরীক্ষা করে পোনা ছাড়া।
- পুকুরের বিষাক্ততার মাত্রা বেশি হলে পানি কমিয়ে এনে বা বদলিয়ে বিশুদ্দ উৎসের পানি সংযোজন।

১১. চিংড়ির চাষের ক্ষেত্রে আশ্রয়স্থল স্থাপন (Construction of shelter for prawn)

চিংড়ির আশ্রয়স্থল স্থাপন

খোলস বদলের সময় চিংড়ি দূর্বল থাকে। তখন এদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থলের প্রয়োজন হয়। কারণ সব চিংড়ি একই সময়ে খোলস বদলায় না। এ সময় সবল চিংড়ি অর্থাৎ যেগুলো খোলস বদলায় না সেগুলো দূর্বলগুলোকে ধরে খেয়ে ফেলতে পারে। পুকুর/ঘেরের তলায় কিছু আশ্রয়স্থল দেওয়া উচিত।

আশ্রয়স্থল স্থাপনের গুরুত্ব

- চুরির হাত হতে চিংড়িকে রক্ষা করে।
- উচ্চ তাপমাত্রা থেকে চিংড়িকে রক্ষা করে।
- খোলস পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বিরূপ পরিবেশ থেকে চিংড়িকে রক্ষা করে।
- সাবস্ট্রেটাম হিসেবে প্রাকৃতিক খাদ্য (পেরিফাইটন) জন্মাতে সাহায্য করে।

আশ্রয়স্থল স্থাপনের উপকরণঃ

- জলজ উদ্ভিদ (হাইড্রিলা, নাজাস)
- তাল বা নারিকেলের শুকনা পাতা, বাঁশের কঞ্চি
- গ্লাষ্টিকের পাইপ, কলসের টুকরা, চোঙ্গাকার বাঁশ ইত্যাদি।

উল্লেখ্য তাল বা নারিকেলের কাঁচা পাতা ব্যবহার করলে তা চিংড়ির রং কালচে বা খয়েরী করে ফেলে বলে এসবের কাঁচা পাতা ব্যবহার না করাই উত্তম।

আশ্রয়স্থল স্থাপন কৌশলঃ

তাল বা নারিকেলের শুকনা পাতা এমন ভাবে মাটিতে পুঁতে দিতে হবে যাতে পাতার অংশ মাটি থেকে একটু উপরে থাকে। বাঁশের কঞ্চি পৃথক পৃথকভাবে অথবা সিমেন্ট বা প্লাষ্টিকের পাইপ পুকুরের তলায় মাটির উপর রেখে দিতে হবে।

চিত্র-৮: পুকুর/ঘেরের তলায় চিংড়ির আশ্রয়স্থল স্থাপন কৌশল

আশ্রয়স্থল স্থাপনের পরিমানঃ

তাল বা নারিকেলের শুকনা পাতা প্রতি শতাংশে ১-২ টি হিসেবে স্থাপন করতে হবে। অন্যান্য বস্তুগুলো আনুপাতিক হারে ব্যবহার করতে হবে।

আশ্রয়স্থল স্থাপনের সময়ঃ

পিএল বা জুভেনাইল মজুদের ১-২ দিন আগে।

আশ্রয়স্থল স্থাপনের সতর্কতাঃ

- কোন অবস্থাতেই কাঁচা পাতাসহ ডাল বা কঞ্চি পুকুরে দেয়া যাবে না।
- কয়েক মাস পর পর ডাল বা কঞ্চি তুলে শুকিয়ে পুনরায় ঘের/পুকুরে দিতে হবে।

(খ) মজুদ কালীন ব্যবস্থাপনাঃ

পোনা ছাড়ার সময় ০৬টি কাজ

৭. পোনার প্রজাত নির্বাচন (Species selection)
৮. মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ (Stocking density determination)
৯. ভাল ও খারাপ পোনা/জুভেনাইল সনাক্তকরণ (Selection of quality fingerling/juvenile)
১০. পোনা পরিবহণ (Fry transport)
১১. পোনা শোধন করা (Fry decontamination)
১২. পোনা অভ্যস্থকরণ ও ছাড়া (Fry acclimatization and release)

১. পোনার প্রজাত নির্বাচন (Species selection)

পুকুরে যে সব প্রজাতির মাছ ও চিংড়ি চাষ করা হয় এদের খাদ্য অভাস ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে এবং এরা পানির বিভিন্ন স্তরে বাস করে সাধারণত সেখান থেকেই খাদ্য গ্রহন করে। এদের মধ্যে কাতলা, সিলভার কার্প ও বিগহেড পানির উপরের স্তরে, রুই মধ্যস্তরে এবং মৃগেল, কার্পিও, মিরর কার্প ও চিংড়ি পানির নীচের স্তরে বাস করে। কেবলমাত্র সরপুটি ও গ্রাসকার্প মাছ পানির সকল স্তরে বিচরণ করে। সে কারণে পুকুরে যদি শুধুমাত্র কোন এক স্তরে বসবাসকারী মাছ বা চিংড়ি ছাড়া হয় তাহলে এরা ঐ স্তরের খাদ্য ও বাসস্থান নিয়ে প্রতিযোগীতা করে কিন্তু অন্য স্তর অব্যবহৃত অবস্থায় থেকে যায়।

সারণী-১১ঃ বিভিন্ন মাছের খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস

মাছ	প্রধান প্রাকৃতিক খাদ্য	খাদ্যাভ্যাস	মন্তব্য
কাতলা	জুপ্লাংকটন	উপর ও মধ্যস্তর	
সিলভার কার্প	ফাইটোপ্লাংকটন	উপর স্তর	
গ্রাস কার্প	জলজ উদ্ভিদ, নরম ঘাস পাতা	প্রধানত: উপরস্তর, সর্বস্তর	উদ্ভিদভোজী
বিগহেড কার্প	জুপ্লাংকটন	উপর স্তর	
রুই	জুপ্লাংকটন, পঁচা জৈব পদার্থ	মধ্য ও নিম্ন স্তর	
মৃগেল	জুপ্লাংকটন,পঁচা জৈব পদাথ, তলার কীট	নিম্ন স্তর	
কালিবাউস	জুপ্লাংকটন, পঁচা জৈব পদার্থ, তলার কীট	নিম্ন স্তর	
মিরর কার্প/ কার্পিও	জুপ্লাংকটন, জৈব পদার্থ, ছোট শামুক, তলার কীট	নিম্ন স্তর	
সরপুঁটি	জুপ্লাংকটন, ফাইটোপ্লাংকটন, নরম জলজ উদ্ভিদ	প্রধানত: উপর ও মধ্য স্তর	উদ্ভিদভোজী
মাগুর	রাক্ষুসে, পঁচা জৈব পদার্থ	নিম্ন স্তর	মাংশাসী
তেলাপিয়া	জুপ্লাংকটন, ফাইটোপ্লাংকটন, পঁচা জৈব পদার্থ	উপর ও মধ্যস্তর	
গলদা চিংড়ি	জুপ্লাংকটন, ফাইটোপ্লাংকটন, তলার কীট, ছোট শামুক, পঁচা জৈব পদার্থ	নিম্ন স্তর	মাংশাসী

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে শুধুমাত্র কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষে ৬-৭ প্রজাতির পোনা মজুদ করা গেলেও কার্প-চিংড়ি মিশ্রচাষে মৃগেল, কার্পিও বা মিরর কার্পের পোনা মজুদ করা ঠিক নয়। কারণ এরা খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য চিংড়ির সাথে প্রতিযোগীতা করে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ঘেরের চাষীদের মতে চিংড়ির সাথে মিশ্রচাষের জন্য কাতলা, সিলভার কার্প, রুই ও গ্রাসকার্প হচ্ছে সবচেয়ে উপযোগী প্রজাতি। তবে বিগহেড এবং সরপুটিও লাভজনকভাবে চাষ করা যায়। কিন্তু তলার খাদ্য গ্রহণকারী মৃগেল, কার্পিও, মিরর কার্প চিংড়ির সাথে চাষ না করাই ভাল। অধিক উৎপাদন প্রাপ্তি ও লাভজনকভাবে চাষ করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মাছের প্রজাতি নির্বাচন করা উচিত-

- পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্যের যথার্থ ব্যবহারে সক্ষম
- স্বল্পমূল্যের ও সহজলভ্য সম্পূরক খাদ্য খায়
- খাদ্য শিকল ছোট এবং দ্রুত বর্ধনশীল
- রাক্ষুসে স্বভাবের নয়
- এলাকাগত চাহিদা ও বাজারদর ভাল
- বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক
- পোনার সহজ প্রাপ্যতা
- অন্য প্রজাতির সাথে খাদ্য ও বাসস্থান নিয়ে প্রতিযোগিতা করে না।
- সহজে রোগে আক্রান্ত হয় না ।

২. মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ (Stocking density determination)

লাভজনকভাবে মাছ ও চিংড়ি উৎপাদনের জন্যে সঠিক মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মজুদ ঘনত্ব চাষীর সার্বিক অবস্থার কারণে কম বা বেশি হতে পারে। চাষীর দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, আর্থিক সামর্থ, মাছচাষে বিনিয়োগের ইচ্ছা, চাষের ধরণ, চাষের সময, উৎপাদিত মাছের সম্ভাব্য আকার ইত্যাদির বিবেচনায় মজুদ ঘনত্ব সবসময় সবার জন্য একনকম নাও হতে পারে। যাহোক, পুকুর/ঘেরের অবস্থাভেদে একক ও মিশ্রচাষের কিছু নমুনা ঘনত্ব উল্লেখ করা হলো।

চিংড়ির একক চাষে মজুদ ঘনত্ব

ক. ঘেরটি প্রথমে নার্সারী ও পরে মজুদ কাজে ব্যবহৃত হলে ৮০-১০০টি পিএল/শতাংশ।
খ. ঘেরটি পুরোপুরি বড় চিংড়ি উৎপাদনে ব্যবহৃত হলে ১২০-১৬০ট পিএল/শতাংশ।
গ. ঘেরটি পুরোপুরি নার্সারী হিসেবে ব্যবহৃত হলে ১০০০-২০০০টি পিএল/শতাংশ।

কার্প-চিংড়ি মিশ্র চাষে মজুদ ঘনত্ব

সারণী-১২ ঃ মাছ ও গলদা চিংড়ির মজুদ ঘনত্বের নমুনা (শতাংশে)

মাছের প্রজাতি	আকার (সে.মি)	নমুনা-১	নমুনা-২	নমুনা-৩	নমুনা-৪
কাতলা	৭-১০	৪-৫	-	৬-৭	৫-৭
সিলভার কার্প	৭-১০	৯-১০	৯-১০	৭-৯	৫-৭
বিগহেড	৭-১০	-	৩-৪	-	-
গ্রাসকার্প	১০-১৫	২-০	১-২	১-২	০-১
রুই	৭-১০	৭-৮	৮-৯	৭-৯	৪-৫
রাজপুঁটি	৩-৫	১-২	২-০	২-৩	১-০
গলদা চিংড়ি	৩-৫	৩২-৩৫	৩২-৩৫	৩২-৩৫	৫০-৬০
মোট		**৫৫-৬০**	**৫৫-৬০**	**৫৫-৬৫**	**৬৫-৮০**

উপরোক্ত মজুদ ঘনত্বটি সাধারণ মানের ব্যবস্থাপনার পুকুর/ঘেরের জন্য। দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, আর্থিক সামর্থ, পুকুরের উৎপাদনশীলতা, চাষের ধরণ, পরিবেশ ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে এই মজুদ ঘনত্ব পরিবর্তিত হতে পারে।

অন্যান্য মাছের একক চাষে মজুদ ঘনত্ব

ক. কৈ মাছ ২৫০-৩০০টি, পানি পরিবর্তনের সুবিধা থাকলে ৪০০-৫০০টি/শতাংশ।
খ. শিং মাছ ৪০০-৫০০টি/শতাংশ, মাটি ও পানির গুনাগুন ভাল রাখতে সাথী ফসল হিসাবে মাগুর ৩০-৫০টি/শতাংশ ও সিলভার কার্প ১-২টি/শতাংশ।
গ. পাঙ্গাস মাছ ১০০-১৫০টি/শতাংশ, মাটি ও পানির গুনাগুন ভাল রাখতে সাথী ফসল হিসাবে মনোসেক্স তেলাপিয়া ২০-৩০টি/শতাংশে অথবা মাগুর ১৫-২০টি/শতাংশ ও সিলভার কার্প ১-২টি/শতাংশ।
ঘ. মনোসেক্স তেলাপিয়া ২০০-২৫০টি, মাটি ও পানির গুনাগুন ভাল রাখতে সাথী ফসল হিসাবে মাগুর ১০-১৫টি/শতাংশ অথবা শিং ২০-৩০টি/শতাংশ।
ঙ. থাই সরপুঁটি ৪-৫ সে,মি আকারের পোনা ২০০০টি/ শতাংশ।

৩. ভাল ও খারাপ পোনা/জুভেনাইল সনাক্তকরণ (Selection of quality fingerling/juvenile)

শুধু সঠিক সংখ্যায় পোনা ও পিএল বা জুভেনাইল মজুদ করলেই ভাল উৎপাদন পাওয়া যাবে না। বেশী উৎপাদন পাওয়ার জন্যে সঠিক মজুদ ঘনত্বের পাশাপাশি ভাল মানসম্পন্ন সুস্থ সবল পোনা ও পিএল বা জুভেনাইল মজুদ করতে হবে। যথাযথ মান সম্পন্ন পোনা ও পিএল বা জুভেনাইল মজুদ না করা হলে মজুদের পর ব্যাপক হারে মারা যেতে পারে, বর্ধন হার কম হতে পারে, সময়মত বিক্রয়যোগ্য না হওয়ায় বাজার মূল্য কম পাওয়া যেতে পারে। এসব কারণে পুকুরে মজুদের পূর্বে এগুলির যথাযথ গুণগতমান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। গুনগত মান সম্পন্ন এবং খারাপ পোনা বা জুভেনাইলের কিছু সনাক্তকারী বৈশিষ্ট নিম্নে আলোচনা করা হলো।

চিংড়ির জুভেনাইল

- ভাল জুভেনাইলের দেহ নীলাভ-সাদা/ছাই রংয়ের, খারাপ জুভেনাইল লালচে/কালচে।
- ভাল জুভেনাইলের এন্টেনা ও উপাঙ্গসমূহ ভাঙ্গা থাকে না ।
- ভাল জুভেনাইলের খোলস পরিস্কার কিন্তু খারাপ জুভেনাইলের খোলস কালচে ও শেওলাযুক্ত।
- ভাল জুভেনাইলের খাদ্য থলি পরিপূর্ণ, খারাপ জুভেনাইলের খাদ্য থলি আংশিক পরিপূর্ণ বা খালি থাকে।

মাছের পোনা

- সুস্থ্য সবল পোনা চঞ্চল, সন্তরণশীল কিন্তু খারাপ পোনা ধীর-স্থির।
- ভাল পোনার আঁইশ রুপালী, ঝকমকে উজ্জ্বল, খারাপ পোনার দেহ ফ্যাকাসে।
- ভাল পোনার দেহ পিচ্ছিল, খারাপ পোনার দেহ খসখসে।
- ভাল পোনার দেহে কোন দাগ নাই, খারাপ পোনার দেহ, পাখনা ও ফুলকায় লাল দাগ থাকে
- ভাল পোনার লেজে হালকা চাপ দিলে জোড়ে জোড়ে নড়াচরা করে ছুটে যেতে চায়।
- ভাল পোনা পাত্রে স্রোত সৃষ্টি করলে স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটে, খারাপ পোনা স্রোতের অনুকূলে সাঁতার কাটে অথবা পাত্রের মাঝখানে জড়ো হয়

৪. পোনা পরিবহণ (Fry transport)

আমাদের দেশে বর্তমানে আধুনিক পদ্ধতিতে অক্সিজেন ব্যাগে কার্পজাতীয় মাছের রেণু ও চিংড়ির পিএল এবং সনাতন পদ্ধতিতে ড্রাম বা এ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িতে চিংড়ির জুভেনাইল ও মাছের চারাপোনা পরিবহণ করা থাকে। তবে সুযোগ থাকলে আধুনিক পদ্ধতিতে চারাপোনা ও জুভেনাইল পরিবহণ ও অধিক নিরাপদ। সনাতন পদ্ধতিতে পরিবহণকালে ড্রাম বা এ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ির গায়ে ধাক্কা লেগে পোনার দেহে ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে এবং পাত্রের পানিতে অক্সিজেন স্বল্পতা দেখে দিতে পারে, এমনকি ব্যাপক হারে পোনা মারা যেতে পারে। পক্ষান্তরে, অক্সিজেন ব্যাগে পরিবহণকালে অক্সিজেনের অভাব হয় না ও পোনার শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। সে কারণে সনাতন পদ্ধতিতে পোনা ও জুভেনাইল পরিবহণে অধিক সতর্কতা ও প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়।

পরিবহনকালে পোনা মৃত্যুর কারণ

সাধারণত যে সব কারণে পোনার মৃত্যু ঘটে থাকে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নীচে উল্লেখ করা হলো-

- অধিক ঘনত্বে পোনা পরিবহন
- পরিবহন পাত্রের পানির অক্সিজেন ঘাটতি
- শারীরিক ক্ষত সৃষ্টি
- পরিবহন পাত্রের পানিতে অ্যামোনিয়া সৃষ্টি
- অধিক দূরত্বে অধিক সময়ব্যাপী পরিবহন
- পরিবহন পাত্রের তাপমাত্রা বৃদ্ধি
- পোনার শারীরিক দূর্বলতা
- পোনাকে ছায়াযুক্তভাবে পরিবহন না করা
- পোনার পাত্রে অক্রিজেন সরবরাহে ত্রুটি ইত্যাদি।

পরিবহনকালীন বিবেচ্য বিষয়ঃ

মাছ ও চিংড়ির পরিবহন ঘনত্ব নির্ভর করে উহাদের জাত, ওজন/ওজন, তাপমাত্রা, শারীরতাত্ত্বিক অবস্থা ইত্যাদির উপর। যেমন- কাতলা ও সিলভার কার্পের পরিবহনকালীন ঘনত্ব অন্যান্য মাছের তুলনায় ৩০% কম হওয়া বাঞ্চনীয়।

- তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে মাছ ও চিংড়ির অক্সিজেন চাহিদা বাড়তে থাকে। ফলে পরিবহনকালে পাত্রের তাপমাত্রা কম রাখার ব্যবস্থা করা উচিত। কম তাপমাত্রা এবং পিএইচ একটু বেশী থাকলে মাছ ও চিংড়ির বিপাক কম হয়। তাই পাত্রের পানি ঠান্ডা রাখার জন্য প্রতি ঘন্টা পরিবহন সময়ের জন্য লিটার প্রতি ১০ গ্রাম বরফ মিশানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
- মাছের পোনা ও জুভেনাইলের আকার যত বড় হবে পরিবহণ ঘনত্ব তত কম ও অক্সিজেন সরবরাহ তত বেশী থাকতে হবে।
- পেটে খাবার থাকলে অক্সিজেন চাহিদা বেড়ে যায়। সে কারণে পোনা পরিবহনের আগে পেট খালি করে নিতে হবে। পেট খালি করে না নিলে পোনার প্রোটিন বিপাক এবং বর্জ্যের উপর ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়ার ফলে পানিতে অ্যামোনিয়া বেড়ে যায়।

- কার্প জাতীয় মাছের পোনা পরিবহনকালে পোনার খারাপ অবস্থার প্রতি স্পর্শকাতরতা কমানোর জন্য ৩ গ্রাম/লিটার হারে খাবার লবণ মিশালে ভাল ফল পাওয়া যায়। ***কিন্তু পাংগাস ও চিংড়ির পোনার জন্য কোনভাবেই লবণ ব্যবহার করা যাবে না।***

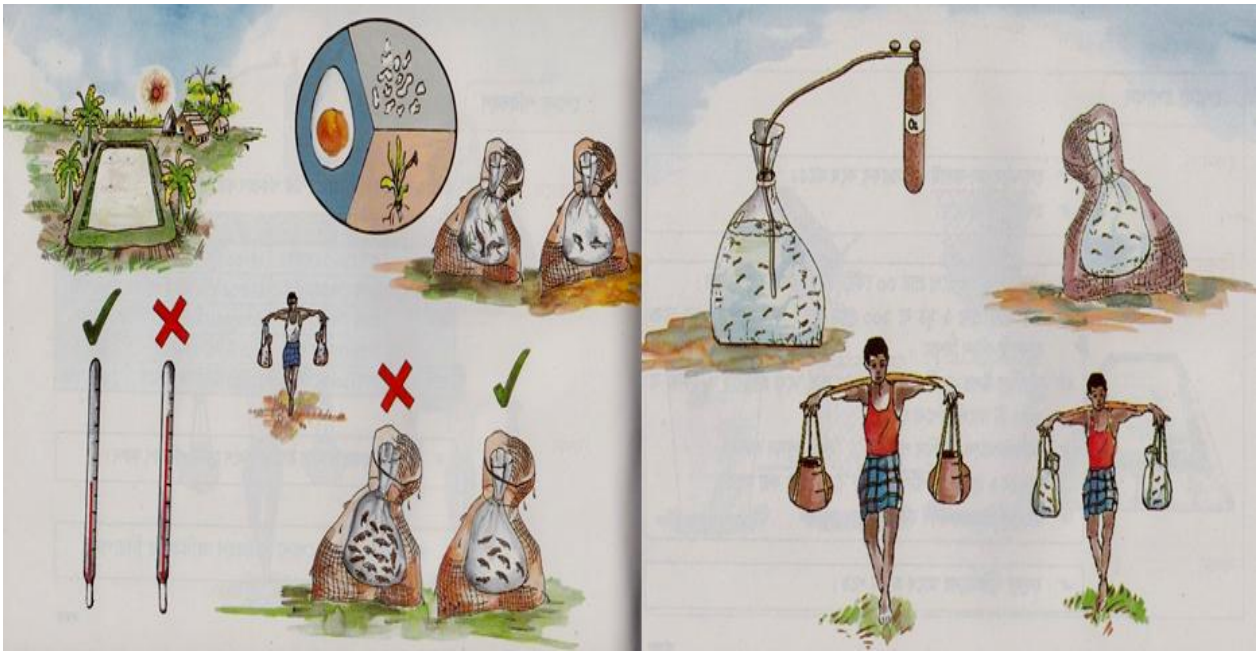

চিত্র-৯: পোনা প্যাকিং ও পরিবহন

আধুনিক পদ্ধতিতে পোনা পরিবহনের নিয়ম

আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ ও চিংড়ির পোনা প্যাকিং ও পরিবহন পদ্ধতি মোটামুটি একই রকমের। তবে চিংড়ির পোনার ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহনের প্রয়োজন হয়। নীচে আধুনিক পদ্ধতিতে পোনা প্যাকিং ও পরিবহনের নিয়ম আলোচনা করা হলো

- পরিবহনের কমপক্ষে ২ ঘন্টা পূর্বে খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে। তবে দূর পাল্লায় পিএল পরিবহনের ক্ষেত্রে জীবিত খাদ্য হিসেবে আর্টিমিয়া নপ্লি বা প্রতি ৫০০০ পিএল'র জন্য একটি সিদ্ধ ডিমের কুসুমের ১/৮ অংশ গুলে দিতে হবে।
- পলিথিন ব্যাগে ছিদ্র আছে কি না তা ভালভাবে পরীক্ষা করতে হবে। একটি ব্যাগের ভেতর আরেকটি ব্যাগ ঢুকিয়ে পোনাগুলো শক্তভাবে বাঁধতে হবে যেন সে সব স্থানে কোনক্রমেই পোনা আটকে না যায়।
- শুধুমাত্র চিংড়ির পিএল বা জুভেনাইল পরিবহনের ক্ষেত্রে প্যাকিংয়ের পূর্বে আশ্রয়ের জন্য কিছু জলজ আগাছা ব্যাগের ভেতর দিতে হবে।
- এবার পিএল বা মাছের পোনা ব্যাগের ভিতর নিয়ে ২/৩ অংশ অক্সিজেন দ্বারা পূর্ণ করতে হবে এবং পলিথিন ব্যাগের মুখে শক্ত করে বাঁধন দিতে হবে। একসাথে অনেক ব্যাগ পরিবহন করা হলে ব্যাগগুলো তাপ অপরিবাহী কার্টুনে নিয়ে পরিবহন করা অধিক নিরাপদ।

পরিবহণ ঘনত্ব

সারণী-১৩: কার্পের পোনার পরিবহণ ঘনত্ব

পরিবহণ পদ্ধতি	আকার (সে.মি)	ঘনত্ব/লিটার পানি	পরিবহণ দূরত্ব (ঘন্টা)
অক্সিজেন ব্যাগ	৩	৩৩-৩৫ টি	১০-১২
	৪	২০টি	১০-১২
	৫	১৩টি	১০-১২
	৬	৫টি	১০-১২
	৭	৪টি	১০-১২
সনাতন পদ্ধতি (পাতিল)	৩-৫	১৫টি	৩-৪
	৭-১০	৫-৬টি	৩-৪

উল্লেখ্য, পাঙ্গাশের চারা পোনার ঘনত্ব কার্পের ২০-২৫% বেশি হতে পারে।

সারণী-১৪: চিংড়ি পোনার পরিবহণ ঘনত্ব

পরিবহণ পদ্ধতি	আকার (সে.মি.)	ঘনত্ব/লিটার পানি	পরিবহণ দূরত্ব (ঘন্টা)
অক্সিজেন ব্যাগ	পিএল	১২৫-১৫০টি	১২-১৬
	পিএল	৩০০-৩৫০টি	৬
	জুভেনাইল	১০০টি	৬
সনাতন পদ্ধতি (পাতিল)	পিএল	২৫০-৫০০টি	১-১.৫
	জুভেনাইল	১৫-২০টি	৪-৬

পরিবহনকালীন সর্তকতা

- ব্যাগে যাতে কোন প্রকার চাপ না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- পরিবহন পাত্র ভেজা কাপড় বা চট দ্বারা ঢেকে রাখতে হবে।
- পরিবহনকালে ব্যাগ/পাতিল ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে।
- একই ব্যাগ বা পাত্রে সমান আকারের পিএল পরিবহন করতে হবে।
- ব্যাগে যাতে কোন শক্ত বস্তুর আঘাত না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- পানি ঠান্ডা রাখার জন্য প্রতি ঘন্টা পরিবহন দূরত্বে লিটার প্রতি ১০ গ্রাম হারে বরফ দিলে ভাল হয়। ব্যাগের ১/৩ অংশ পানি পূর্ণ করতে হবে।

৫. পোনা শোধন করা (Fry decontamination)

অনেক সময় পরিবহণকৃত পোনার সাথে রোগাক্রান্ত পোনা চলে আসতে পারে যা পুকুরে ছাড়ার পর অন্যদের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই পোনা পুকুরে ছাড়ার পূর্বে পোনাগুলোকে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে একটি বালতির মধ্যে ১০-১৫ লিটার পানি নিয়ে তার মধ্যে এক থেকে দেড় চা চামচ পরিমাণ পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট অথবা ২০০ গ্রাম লবণ মেশাতে হবে। তারপর পোনাগুলোকে উক্ত মিশ্রণে ১-২ মিনিট গোসল করানোর পর পুকুরে ছাড়তে হবে। তবে এ কাজটি পোনা ব্যাগে ঢুকানোর আগেই করলে ভাল হয়।

চিত্র-১০: পোনা শোধন প্রক্রিয়া

৬. পোনা অভ্যস্থকরণ ও ছাড়া (Fry acclimatization and release)

যে কোন পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা হোক নাকেন পোনা অভ্যস্তকরনের কৌশলটি খুবই গুরুত্বপূর্ন। পোনা পরিবহণের পর সরাসরি পানিতে ছাড়া ঠিক নয়। কারণ পোনা পরিবহণ পাত্র ও পুকুরের পানির তাপমাত্রা ও অন্যান্য গুণাগুনের ব্যবধানের কারনে হঠাৎ করে পোনা পানিতে ছেড়ে দিলে আকস্মিক পরিবর্তনের কারনে পোনা মারাও যেতে পারে। ফলে ফলন ভালো হবে না। তাই পোনা পুকুরে ছাড়ার পূর্বে নিম্ন লিখিত কাজগুলো করতে হবে ।

- পরিবহন পাত্র ১৫-২০ মিনিট পুকুরের পানিতে ভাসিয়ে রাখতে হবে।
- ব্যাগ বা পাত্রের মুখ খোলার পর আস্তে আস্তে পাত্র ও পুকুরের পানি অদল বদল করে দুই পানির তাপমাত্রা সমতায় আনতে হবে।
- অতঃপর হাত বা থার্মোমিটার হাত দিয়ে মাঝে মাঝে পরিবহন পাত্র এবং পুকুরের পানির তাপমাত্রার ব্যবধান পরীক্ষা করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন দুই পানির তাপমাত্রার ব্যবধান ১-২° সে এর বেশী না হয়।
- উভয় পানির তাপমাত্রা সমান হলে পাত্রের মুখ কাত করে ধরে বাহির থেকে ভিতরের দিকে স্রোতের ব্যবস্থা করতে হবে। এ অবস্থায় সুস্থ্য, সবল পোনা স্রোতের বিপরীতে ধীরে ধীরে বাইরে চলে যাবে। লক্ষণীয় যে পাড়ের কাছাকাছি অল্প গভীরতায় পোনা ছাড়তে হবে, ঘের বা পুকুরের মাঝখানে নয়।

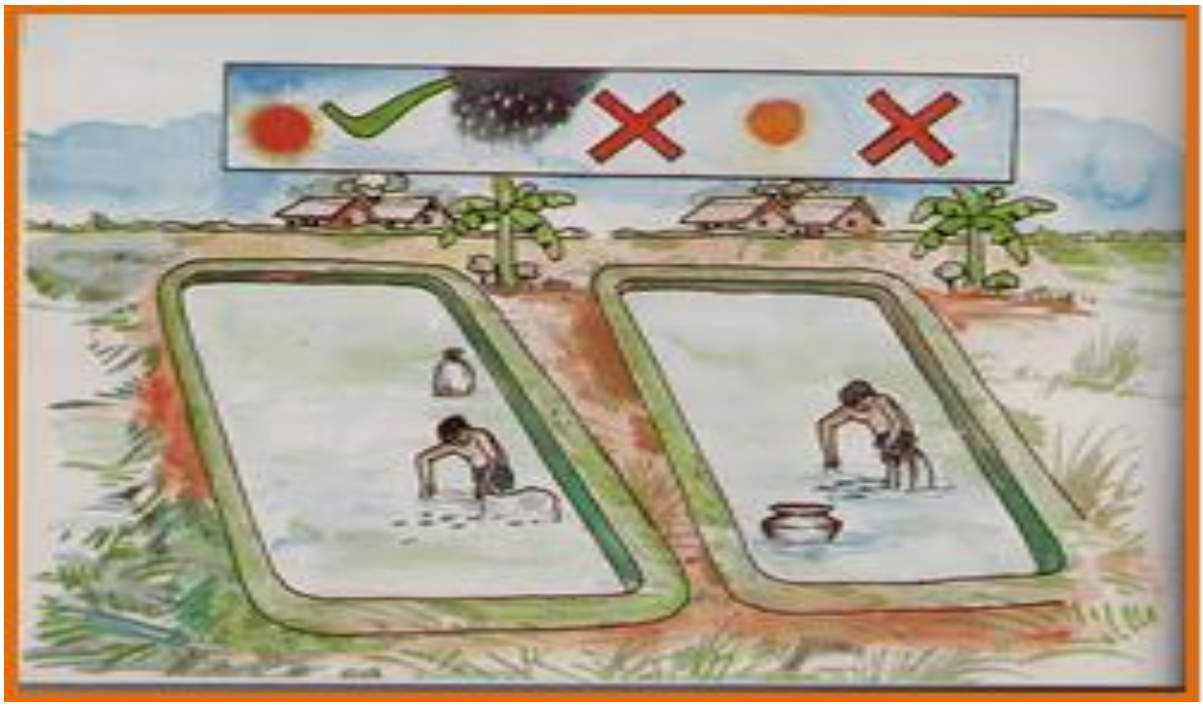

চিত্র-১১: পোনা অভ্যস্তকরণ ও ছাড়া

পোনা ও পিএল ছাড়ার সময়

ঠান্ডা আবহাওয়ায় দিনের যে কোন সময়ে পুকরে মাছের পোনা ছাড়া যায়। তবে পোনা ছাড়ার কাজ সকাল অথবা বিকেলে করাই উত্তম। দুপুরের রোদ, মেঘলা দিন বা ভ্যাপসা আবহাওয়ায় (বিশেষতঃ নিম্নচাপের দিনে) পুকুর বা ঘেরে মাছের পোনা বা পিএল ছাড়া একেবারেই উচিত নয়। চিংড়ি পোনা সন্ধ্যার পর ছাড়াই নিরাপদ।

(গ) মজুদ পরবর্তী করনীয় কাজ

পোনা ছাড়ার পরের ০৭টি কাজ

১. পোনা বাঁচার হার নির্ধারণ (Fry survivability determination)
২. মজুদ পরবর্তী সার প্রয়োগ (Post-socking fertilization)
৩. সম্পুরক খাদ্য প্রয়োগ (Supplimentary feeding)
৪. নমুনায়ন (Sampling)
৫. মাছ ধরা, বিক্রয় ও বাজারজাতকরণ (Fish harvesting, sale and marketting)
৬. পুনরায় পোনা মজুদকরণ (Re-stocking)
৭. রেকর্ড সংরক্ষণ (Record keeping)

১. পোনা বাঁচার হার নির্ধারণ (Fry survivability determination)

পোনা ছাড়ার পর আংশিক অথবা সব পোনা মারা যেতে পারে। তাই পুকুরে পোনা টিকলো কিনা বা কতগুলো বেঁচে থাকলো তা পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। যদি পোনা ছাড়ার পরদিন সকাল বেলা দেখা যায় যে, কিছু পোনা মারা গেছে তবে যত গুলো পোনা মারা গেছে তত গুলো পোনা পুনরায় মজুদ করতে হবে।

২. মজুদ পরবর্তী সার প্রয়োগ (Post-socking fertilization)

মাছের প্রাকৃতিক খাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য তথা মাছের ভাল বৃদ্ধির জন্য প্রতিনিয়ত সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এই প্রয়োগ দৈনিক বা সাপ্তাহিক মাত্রায় হতে পারে।

সারণী-১৫: মজুদ পরবর্তী সার প্রয়োগমাত্রা

সারের নাম	পরিমান/শতাংশ/দিন	পরিমান/শতাংশ/সপ্তাহ
ইউরিয়া	১০ গ্রাম	৭০ গ্রাম
টিএসপি	১০ গ্রাম	৭০ গ্রাম
কম্পোষ্ট	৩০০-৪০০ গ্রাম	২-৩ কেজি
গোবর	২০০ গ্রাম	১.৪ কেজি

ইউরিয়া বাদে গোবর ও টিএসপি সার একত্রে ৩ গুন পানিতে ১২-২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর সার ছিটানোর ২০-৩০ মিনিট আগে ইউরিয়া মিশিয়ে ভালভাবে নাড়াচাড়া করতে হবে। তারপর গুলানো সার সমস্ত পুকুরে সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। ছিটানোর কাজটি সকাল ১০-১১ টার দিকে হলে ভাল হয়।

৩. সম্পুরক খাদ্য প্রয়োগ (Supplimentary feeding)

সম্পূরক খাদ্য কি ?

মাছ ও চিংড়ির দ্রুত বৃদ্ধি এবং অল্প সময়ে অধিক উৎপাদন পাওয়ার জন্য প্রাকৃতিক খাবারের পাশাপাশি বাইরে থেকে যে সব বাড়তি খাবার দেয়া হয় এদেরকে সম্পূরক খাবার বলে।

সম্পূরক খাদ্য ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা

- অধিক ঘনত্বে মাছ ও চিংড়ি চাষ করা যায়
- অল্প সময়ে মাছ ও চিংড়ি বিক্রয় উপযোগী হয়
- মাছ ও চিংড়ির মৃত্যু হার অনেকাংশে কমে যায়
- মাছ ও চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
- চিংড়ির স্বজাতিভোজীতা রোধ করে
- অধিক উৎপাদন পাওয়া যায়।

চিত্র-১২: বিভিন্ন প্রকার সম্পূরক খাবার

খাদ্য নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়

মাছ ও চিংড়ি চাষের জন্য খাদ্য নির্বাচনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় উল্লেখ করা হলো

- উপাদানসমূহের সহলভ্যতা, অর্থাৎ উপাদানসমূহ চাষীর ঘরে বা আশপাশেই পাওয়ার সুবিধা
- চাষীর আর্থিক সংগতি ও উপকরণের মূল্য
- মাছ ও চিংড়ির পুষ্টি চাহিদা
- মাছ ও চিংড়ির রুচি ও পছন্দ, যেমন মাংশাসী মাছের ক্ষেত্রে মিট ও বোন মিল রাখা, উদ্ভিদভোজী মাছের জন্য নরম ঘাস-পাতা রাখা ইত্যাদি।
- উচ্চ খাদ্য পরিবর্তন হার অর্থাৎ যেসব খাদ্যের কম পরিমানে অধিক দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে।

মাছ ও চিংড়ির পুষ্টি চাহিদা

সুস্থ সবলভাবে বেঁচে থাকা ও দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধির জন্য মাছ ও চিংড়ির খাদ্যে সুষম খাবারের সবগুলো উপাদান অপরিহার্য কিন্তু এ সব খাদ্য উপাদানের মধ্যে আমিষ সবচেয়ে বেশি মাত্রায় প্রয়োজন। সে কারণে মাছ ও চিংড়ির পুষ্টি চাহিদা বলতে সাধারণভাবে আমিষের চাহিদাকে বুঝানো হয়। মাছ ও চিংড়ির খাদ্য তৈরিতে যে সব উপকরণ ব্যবহার করা হয় সেগুলোর প্রত্যেকটিতে খাদ্যের অন্যান্য উপাদান যেমন শর্করা, চর্বি ও খনিজ লবণ কম-বেশি বিদ্যমান থাকে। এ সব খাদ্যে আমিষের চাহিদা পূরণ হলে অন্যান্য পুষ্টি উপাদানগুলোর খুব একটা অভাব হয় না। মাছ ও চিংড়ির পুষ্টি চাহিদা এদের বয়স ও প্রজাতির উপর নির্ভর করে। নিম্নে বয়সভিত্তিক বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও চিংড়ির পুষ্টি চাহিদার তালিকা দেয়া হলো-

সারণী-১৬: বিভিন্ন বয়সের মাছ ও চিংড়ির খাদ্যের সর্বানুকূল আমিষের চাহিদা

মাছ/প্রজাতি (*Fish/Species*)	আমিষের চাহিদা (%)		
	পোনা (*Fry*)	আঙ্গুলী পোনা (*Fingerlings*)	পূর্ণ বয়স্ক (*Adult*)
১. কমন কার্প (*Cyprinus carpio*)	৪০	৩৮	৩৫
২. রুই (*Labeo rohita*)	৩৫-৪০	৩০	২৫-৩০
৩. কাতলা (*Catla catla*)	৩৫-৪০	৩০	২৫-৩০
৪. ক্যাট ফিস ঃ			
ক. পাবদা (*Ompok pabda*)	৪০	৩৫	৩০
খ. মাগুর (*Clarias batrachus*)	৪০	৩২	৩০
গ. শিং (*Heteropnuestes fossilis*)	৪০	৩৫	৩০
ঘ. পাঙ্গাস (*Pangasius pangasius*)	৪০	৩৫	৩০
৫. তেলাপিয়া ঃ			
ক. নাইলোটিকা (*Oreochromis niloticus*)	৩৫-৪০	৩০	২৫
৬. চিংড়ি ঃ			
ক. গলদা চিংড়ি (*Macrobrachium rosenbergii*)	৩৫-৪০	৩০	৩০
খ. বাগদা চিংড়ি (*Penaeus monodon*)	৩৫-৪০	৩০-৩৫	৩০

সম্পূরক খাদ্য তৈরি

বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ব্যবহার করে খুব সহজেই মাছ ও গলদা চিংড়ির খাদ্য তৈরি করা যায়। চাষি নিজের হাতেই তা করতে পারেন। সম্ভব হলে মিনসিং মেশিন ব্যবহার করেও খাদ্য তৈরি করা যেতে পারে। নিচে মাছ ও চিংড়ি চাষের পুকুরে প্রয়োগের জন্য মিশ্র খাদ্য তৈরির পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

- প্রয়োজনীয় খৈল কমপক্ষে ১২-২৪ ঘণ্টা পূর্বে দ্বিগুণ পানিতে ভিজিয়ে রেখে উপর থেকে ভাসমান তৈলযুক্ত পানি ফেলে দিতে হবে
- চালের কুঁড়া, ভুষি ও ফিসমিল ভালভাবে চালুনি করে নিতে হবে
- চালের খুদ ব্যবহার করা হলে সিদ্ধ করে নিতে হবে
- গমস্ত উপকরণগুলো একটি পাত্রে নিয়ে ভালভাবে মেশাতে হবে
- আটা পরিমাণ মত পানিতে ফুটিয়ে আঠালো পদার্থ তৈরি করতে হবে
- উপকরণগুলো আঠালো পদার্থ দ্বারা মেখে কাঁই তৈরি করে ছোট ছোট বল বানাতে হবে।

নিম্নের সারণীতে বর্নিত উপকরণগুলো ব্যবহার করে ৩০% আমিষ মাত্রার খাদ্য তৈরী করা যাবে।

সারণী-১৭: কার্প ও গলদা চিংড়ির সম্পুরক খাদ্য তৈরীর সূত্র

খাদ্য উপাদান	বড় চিংড়ির খাদ্য	
	ব্যবহার মাত্রা (%)	সরবরাহকৃত আমিষ (%)
ফিস মিল	২০.০০	১২.০০
মিট ও বোন মিল	১৫.০০	৮.০০
সরিষার/তিলের খৈল	১৫.০০	৫.০০
চাউলের কুঁড়া	২৪.০০	৩.০০
ভুট্টা	২০.০০	২.০০
চিটাগুড়/আটা	৫.০০	-
ভিটামিন ও খনিজ মিশন	১.০০	-
	১০০.০০	৩০.০০

গলদা চিংড়ির সম্পুরক খাদ্য প্রদানের ক্ষেত্রে বিবেচ্য

- পিএল মজুদ করা হলে ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত স্টার্টার ফিড দেয়া
- ৪ সপ্তাহ পর থেকে চিংড়ির দেহ ওজনের ৫-১০% খৈল, কুড়া, ফিসমিল জাতীয় খাবার দেয়া
- জুভেনাইল মজুদ করা হলে মাছ ও চিংড়ির দেহ ওজনের ৫-১০% খৈল, কুড়া, ফিসমিল, মিট ও বোন মিল জাতীয় খাবার দেয়া
- দৈনিক কমপক্ষে ২ বার সন্ধ্যা বেলা ও সকালে পুকুরের আয়তন অনুযায়ী চারপার্শ্বে ৪-৫টি নির্দিষ্ট স্থানে পিলেট জাতীয় শুকনো খাবার ছিটিয়ে দিতে হবে।
- মিশ্রিত ভেজা খাদ্য হলে পুকুরের আয়তন অনুযায়ী চার দিকে ৪-৫টি নিদির্ষ্ট জায়গায় পানির ১-২ ফুট নিতে চাটাই বা ট্রেতে রেখে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে।

স্টার্টার ফিডের সুপারিশকৃত মাত্রা

- ১ম সপ্তাহ ২০ গ্রাম/১০০০ পিএল, ২য় সপ্তাহ ৪০ গ্রাম/১০০০ পিএল, ৩য় সপ্তাহ ৬০ গ্রাম/১০০০ পিএল, ৪র্থ সপ্তাহ ৮০ গ্রাম/১০০০ পিএল

সবুজ খাদ্য প্রয়োগ

মিশ্র খাদ্য ছাড়াও পুকুরে যদি গ্রাসকার্প ও সরপুঁটি থাকে তবে নিয়মিত ক্ষুদিপানা, কুটি পানা, নরম ঘাস, বিচি কলার পাতা, পেঁপে পাতা, আলুর পাতা, সজনে পাতা, নেপিয়ার ঘাস, শীতকালীন শাক-সবজি ইত্যাদি দিতে হবে। গ্রাসকার্প প্রতি দিন এর দেহ ওজনের প্রায় ৪০-৪৫% পর্যন্ত সবুজ খাদ্য খেতে পারে।

গ্রাস কার্প ও সরপুঁটির খাদ্য বাঁশ বা অন্য কোন উপযুক্ত উপকরণ দিয়ে তৈরী চৌকোণাকার ভাসমান ফ্রেমে (Feeding ring)'র মধ্যে দেয়া ভাল। ফ্রেমটি পাড়ের ১-২ মিটার দূরত্বে স্থাপন করতে হয়। ৩০ শতাংশ পুকুরের জন্যে ফ্রেমের সাধারণ মাপ হচ্ছে ১ বর্গ মিটার। পাতা জাতীয় উদ্ভিদ টুকরো টুকরো করে ফ্রেমের মধ্যে দিতে হয়। কলাপাতা ব্যবহার করা হলে পাতা চিড়ে পল্‌তা পল্‌তা করে দেয়া উচিত। খাদ্য শেষ হওয়ার সাথে সাথে আবার খাদ্য দিতে হবে।

খাদ্যদানী

খাদ্যদানী (ট্রে) তে খাবার দিলে খরচ বাঁচে এবং খাদ্যের ব্যবহার যথার্থ হয়। তা ছাড়া খাদ্যের পরিমাপ করাও সহজ হয়। এটির আকার ১ বর্গ মিটার অথবা ৮০ x ৮০ সেমি হতে পারে। বাঁশ বা কাঠের ফ্রেমের নীচে মশারীর কাপড় লাগিয়ে ধর্ম জালের মতো করে তা তৈরী করা যায়। ফ্রেমটির উচ্চতা ১০ সেমি রাখা উচিত। ৩০ শতাংশ পুকুরে ২টি, ৬০ শতাংশ পুকুরে ৪টি এবং ১০০ শতাংশে ৬ টি খাদ্যদানী স্থাপন করলেই চলে। খাদ্যদানী ব্যবহার করা হলে তা নিয়মিত পরিস্কার করতে হবে।

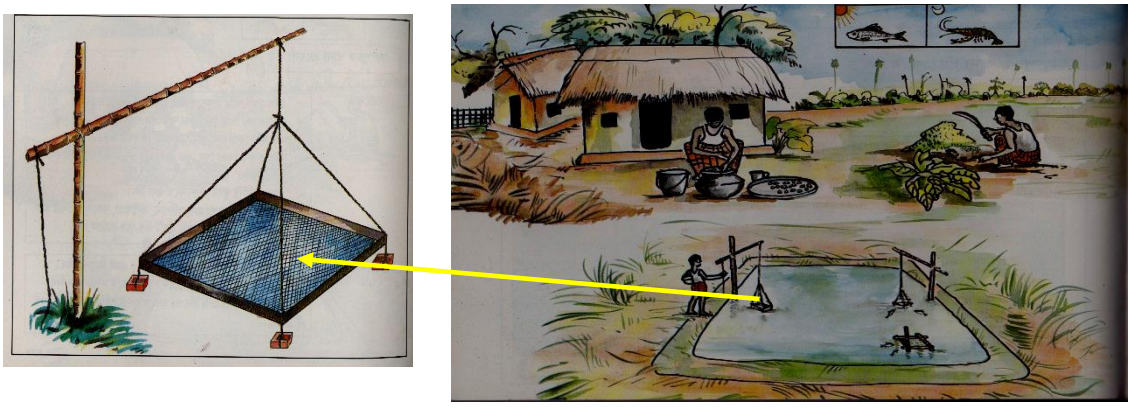

চিত্র-১৩: খাদ্যদানী ব্যবহার করে খাবার প্রয়োগ

খাদ্য প্রয়োগের সতর্কতা

- প্রতিদিন একই সময়ে একই জায়গায় খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে।
- মাঝে মাঝে খাদ্য দানী উঠিয়ে খাবার গ্রহনের পরিমান যাচাইপূর্বক প্রয়োগ মাত্রা পুনঃনির্ধারণ করতে হবে
- পানি অতিরিক্ত সবুজ হলে খাদ্য প্রয়োগ মাত্রা কমিয়ে দিতে হবে বা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে।

প্রতিদিনের খাদ্যের পরিমাণ নির্ণয় পদ্ধতি ঃ

প্রতিদিন মাছ ও চিংড়ির জন্য যে খাদ্য প্রয়োগ করতে হয়, তা নিম্নলিখিত সূত্র মাধ্যমে বের করা যেতে পারে।
প্রতিদিনের খাবার চাহিদা = W×N×S×R

এখানে,

W (গ্রাম) = নির্দিষ্ট সময়ে মাছ/ চিংড়ির গড় ওজন
N = মজুদকৃত মাছের সংখ্যা
S (%) = মাছ ও চিংড়ির বেঁচে থাকার হার
R (%) = খাদ্য প্রয়োগের হার

উদাহরণ

মোট মাছ মজুদ ঃ ১ হেক্টর পুকুরে (N) = ১০,০০০টি
মাছের গড় ওজন ঃ ৩০ দিন পর (W) = ১৫ গ্রাম
মাছ বেঁচে থাকার হার (S) = ৯০ %
খাদ্য প্রয়োগ মাত্রা (R) = ৬ %

প্রতিদিনের খাবার চাহিদা = W×N×S×R

= ১৫ গ্রাম ×১০,০০০×০.৯০×০.০৬/প্রতিদিন

= ৮,১০০ গ্রাম/ প্রতিদিন

= ৮.১ কেজি/ প্রতিদিন

মোট খাদ্য প্রয়োজন (১৫ দিনের জন্য) = ৮.১ কেজি/ প্রতিদিন × ১৫ দিন

=১২১.৫ কেজি

খাদ্য রূপান্তর হার বা এফসিআর নির্ণয় পদ্ধতি (FCR- Food Conversion Ratio)

খাদ্য রূপান্তর হার হলো খাদ্য প্রয়োগ এবং খাদ্য গ্রহণের ফলে জীবের দৈহিক বৃদ্ধির অনুপাত। অর্থাৎ ১ কেজি মাছ পেতে যত কেজি খাবার খাওয়াতে হয়, তাহাই খাদ্য রূপান্তর অনুপাত।

$$\text{এফ.সি.আর} = \frac{\text{প্রদানকৃত খাদ্য}}{\text{দৈহিক বৃদ্ধি}}$$

দৈহিক বৃদ্ধি = আহরণকালীন মোট ওজন - মজুদকালীন মোট ওজন

ধরা যাক, একটি জলাশয়ে মজুতকালীন মাছের মোট ওজন ছিল ১ কেজি। নিয়মিত খাদ্য প্রয়োগ করে ৬ মাস পর আহরণকালে মোট ১৫ কেজি মাছ পাওয়া গেল এবং এই ৬ মাসে মোট ২১ কেজি খাদ্য প্রয়োগ করা হল।

$$\text{সুতরাং এফ.সি.আর} = \frac{২১}{১৫-১} = ১.৫$$

খাদ্য গুদামজাতকরণ

সম্পূর্ণ বা দানাদার খাদ্য তৈরিতে ব্যবহৃত খাদ্য উপকরণ বা তৈরি খাবার গুদামজাতকরণের প্রয়োজন হয়। গুদামজাতকরণের সময় ওজন ও গুণগত মান এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক ক্ষতি হতে পারে। খাদ্য সংরক্ষণের জন্য সুষ্ঠুভাবে গুদামজাতকরণ আবশ্যক।

নিম্নলিখিত নিয়ামকসমূহ গুদামজাতকরণের সময় খাদ্যের গুণগত মান এবং ওজনকে ক্ষতিগ্রস্থ করে-

- **আদ্রতার প্রভাব** ঃ খাদ্যে আদ্রতার পরিমাণ ১০% এর বেশি থাকলে ছত্রাক/ পোকামাকড় জন্মাতে পারে।
- **আপেক্ষিক আদ্রতা** ঃ বাতাসে আপেক্ষিক আদ্রতা ৬৫% এর বেশি থাকলে ছত্রাক/ পোকামাকড় জন্মাতে পারে।
- **তাপমাত্রা** ঃ অতিরিক্ত তাপমাত্রায় খাদ্যের পুষ্টিমান ক্ষতিগ্রস্থ হয়। পোকামাকড় সমূহ ২৬-৩৭° সে. তাপমাত্রায় খুব ভাল জন্মাতে পারে এবং এরা খাদ্য খেয়ে ফেলে ও তাদের মলমূত্র দ্বারা ব্যাকটেরিয়া ছড়িয়ে থাকে।
- **অক্সিজেন সরবরাহ** ঃ অক্সিজেন খাদ্যের রেস্পিডিটি (চর্বির জারন ক্রিয়া) কার্যক্রমে এবং ছত্রাক ও পোকামাকড় জন্মাতে সহায়তা করে।
- এনজাইম (পাঁচক রস) ও জারনের ফলে খাদ্যের গুণগত মান ক্ষতিগ্রস্থ হয়।
- চুরি ও অগ্নিদগ্ধ হয়েও খাদ্য ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

সঠিক গুদামজাতকরণ পদ্ধতি

(ক) শুকনা খাদ্য ও খাদ্য উপাদান

- পরিষ্কার, শুকনা, নিরাপদ এবং পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের ঘরে রাখতে হবে।
- সরাসরি সূর্যের আলোতে রাখা যাবে না।
- মাটি থেকে ১২-১৫ সে: মি: উপরে এবং সর্বোচ্চ ৬টি বস্তা একটির উপর আর একটি রাখা যেতে পারে।
- পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণের জন্য বস্ড়র নীচে এবং আশেপাশে ছাই ছিটিয়ে দেওয়া যেতে পারে।
- তিন মাসের বেশী গুদামজাতকরণ অবস্থায় রাখা যাবে না।
- খাদ্য বস্তার উপর দিয়ে হাটা যাবে না।

(খ) আদ্র/ ভেজা খাদ্য উপাদান

- তাজা ছোট মাছ (trash fish) হলে তাৎক্ষণিক খাওয়াতে হবে, অন্যথায় রেফ্রিজারেটরে রেখে দিতে হবে।
- তৈলাক্ত/ চর্বিযুক্ত খাদ্য কালো রং এর পাত্রে নিম্ন তাপমাত্রায় রেখে দিতে হবে।
- ভিটামিন ও খনিজ লবণসমূহ বাতাস ও আলোবিহিন পাত্র করে রেফ্রিজারেটরে রেখে দিতে হবে।

৪. নমুনায়ন (Sampling)

একটি নিদির্ষ্ট সময় পর পর মাছ বা চিংড়ির বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ইত্যাদি পরীক্ষা করার জন্য নমুনা হিসেবে কয়েকটি চিংড়ি ধরে পর্যবেক্ষন করা বা দেখাই হচ্ছে নমুনায়ন ।

নমুনায়নের প্রয়োজনীয়তা

১. শারীরিক বৃদ্ধি হচ্ছে কি-না তা জানার জন্য নমুনা পর্যবেক্ষন করা অতীব জরুরী।
২. মাছ বা চিংড়ির রোগাক্রান্ত হচ্ছে কি-না তা দেখার জন্য নমুনা পর্যবেক্ষণ করতে হয়।
৩. মাছের বা চিংড়ির দেহের ওজনানুসারে পরিমান মত খাবার প্রয়োগের জন্যও নমুনায়ন প্রয়োজন।

নমুনায়নের সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা

১) অল্প শ্রম ও ব্যয়ে পুকুরের সকল মাছ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।
২) পুকুরের তলায় জমাকৃত ক্ষতিকর বিষাক্ত গ্যাসসমূহ মুক্ত হয়।
৩) তলায় বিদ্যমান বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান পানির সাথে মিশে মাছের প্রাকৃতিক খাবার উৎপাদনে সহায়তা করে।
৪) রাক্ষুসে বা বাজে মাছ পুকুরে ঢুকেছে কি না বুঝা যায়।
৫) পানিতে অক্সিজেন মেশার সুযোগ পায়।

অসুবিধা

নমুনায়ন ফলে পুকুরের মাছ সম্পর্কে অন্যান্যরা জানতে পারে, ফলে চুরির সম্ভাবনা থাকে।

নমুনায়ন পদ্ধতি

১. ১৫ দিন পর পর ঝাঁকি জাল দিয়ে মজুদ ঘনত্বের ৫-১০% মাছ বা চিংড়ি ধরতে হবে।

২. মাছ বা চিংড়িগুলো আলাদাভাবে বা একত্র করে ওজন, দৈর্ঘ্য ইত্যাদি নিয়ে গড় ওৎন, দৈর্ঘ্য বের করতে হবে এবং তা লিখে রাখতে হবে।

৩. পরবর্তী ১৫ দিন পর ওজন, দৈর্ঘ্য নিয়ে আগের পরিমাপের পাথর্ক্য দেখে ওজন, দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পরীক্ষা করতে হবে।

৪. নমুনায়িত মাছ বা চিংড়ি গুলির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে। মাছের ত্বক, পাখনা, লেজ, ফুলকা এবং চিংড়ির এন্টেনা (দাঁড়ি গোঁফ), রোষ্ট্রাম (করাত), লেজ, ফুলকা এবং সাতার পাঁ অঞ্চল ভালোভাবে দেখতে হবে। এসব এলাকায় কোন সংক্রমন বা অস্বাভাবিকতা আছে কি না, কালো বা লাল হয়ে যাচ্ছে কিনা বা পাখনা, দাঁড়ি, গোঁফ পঁচন ধরছে কিনা ইত্যাদি দেখতে হবে।

চিত্র-১৪: নমুনায়নের মাধ্যমে মাছের বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য দেখা

এভাবে ১৫ দিন পর পর নমুনা পর্যবেক্ষন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

৫. **মাছ ধরা, বিক্রয় ও বাজারজাতকরণ** (Fish harvesting, sale and marketting)

মাছ সাধারনতঃ ৮-১০ মাস এবং গলদা চিংড়ি ৫-৬ মাসের মধ্যেই বাজারজাতকরণ আকৃতিতে পৌঁছায়। সকল মাছ বা চিংড়ি একই সময় বাজারজাত আকৃতিতে পৌঁছায় না। তাই ব্যবসায়িক দিক থেকে লাভবান হতে হলে যেগুলি বাজারজাতকরনের উপযোগী হয়েছে সেগুলি বাজারজাতকরনণ করাই উত্তম এবং পর্যায়ক্রমে বাজারজাতকরণ করতে হবে। গলদা চিংড়ি যেহেতু রপ্তানীযোগ্য পন্য তাই বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সর্তকতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

চিত্র-১৫: মাছ আহরণ

আহরনের উপকরন

মাছ ও চিংড়ি সাধারনতঃ বেড় জাল ও ঝাকি জাল দিয়ে আহরন করা হয়ে থাকে। তবে বৎসর শেষে পাম্প দিয়ে পুকুর, ঘের ও ড্রেন শুকিয়ে আহরন করা উত্তম। ***মাছ ধরার আগে ক্রেতা / বাজার এবং জাল / জেলে ঠিক করে নিতে হবে।***

আহরণের সময়

ঠান্ডা এবং পরিষ্কার আবহাওয়ায় মাছ ধরা উচিত। বিশেষ করে ভোর বেলা মাছ ধরার উত্তম সময়। এ ছাড়াও স্থানীয় বাজারের সময়ও বিবেচনায় রাখতে হবে। মাছ যাতে আঘাত প্রাপ্ত না হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

আহরনের পর করনীয়

আহরনের পর দ্রুত বাজারজাতকরনের ব্যবস্থা করতে হবে। সে ক্ষেত্রে মাছ বা চিংড়ি আহরন করার পর পরিস্কার পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে এবং সেগুলো আকৃতি অনুযায়ী পৃথক করে ছায়াযুক্ত স্থানে ও জীবানুমুক্ত পাত্রে রাখতে হবে। পরে স্থানীয় বাজারে এগুলো বাজারজাত করা যেতে পারে। তবে দূরে বাজারজাতকরনের ক্ষেত্রে বরফ দিয়ে সংরক্ষন করে পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হবে।

চিত্র-১৬: মাছ আকৃতি অনুযায়ী পৃথককরা ও বিক্রয়

বর্তমানে চিংড়ি বাজারজাতকরণ দুইভাবে করা যায়। মাথাসহ ও মাথা ছাড়া পদ্ধতিতে। তবে মাথা ছাড়ানোর ক্ষেত্রে ভালো অভিজ্ঞতা না থাকলে না ছাড়ানোই উত্তম এবং পরিচ্ছন্ন ডিপোর বাইরে যত্র তত্র মাথা ছাড়ানোর কাজ না করা উচিত।

মাছ ও গলদা চিংড়ির বাজারজাতকরণ

মাছ ও চিংড়ি বাজারজাতকরণের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো উৎপাদিত বা আহরণকৃত মাছ ও চিংড়ির গুণগতমান অক্ষুণ্ন রাখা। এ লক্ষ্যে যা যা করণীয় অর্থাৎ আহরণের সময় কাল থেকে শুরু করে বরফ দেয়া, স্বাস্থ্যকর পাত্রে সংরক্ষণ ও পরিবহণ, ইত্যাদি বিষয়ে নজর রাখা জরুরী। বিশেষত চিংড়ি বাজারজাতকরণের বিষয়টি অতীব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

চিংড়ি বাজারজাতকরার পদ্ধতি

আকার ও গুণগতমান অনুযায়ী বাছাইকৃত চিংড়ি বাজারজাতকরণের জন্য সুবিধাজনক পরিবহণ পাত্রে বরফ ও চিংড়ি স্তরে স্তরে সাজাতে হবে। বরফ ও চিংড়ির অনুপাত **১:১** হওয়া উচিত। আহরণ ও বাজারজাতকরণের মধ্যবর্তী সময়ে চিংড়িকে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখার ব্যাবস্থা করা উচিৎ। পরিবহণ বাক্সে বা পাত্রের তলায় এক স্তর বরফ দিয়ে তার উপর এক স্তর চিংড়ি সাজাতে হবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে চিংড়ি ও বরফ সাজানোর পরে সবার উপরে পুরু করে এক স্তর বরফ দিয়ে ভেজা চটের ছালা বা হোগলার চাটাই দিয়ে প্যাক করতে (Packing) হবে। এভাবে চিংড়ি সাজানোর

সময় খেয়াল রাখা উচিৎ যেন পাত্রে ২ ফুট এর বেশি উচ্চতায় চিংড়ি সাজানো না হয়। কারণ এতে উপরের চিংড়ি ও বরফের চাপে নিচের চিংড়ির দৈহিক বা আকৃতিগত ক্ষতির আশংকা থাকে।

আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত চিংড়ির কোন সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা গড়ে উঠে নাই। ফলে চিংড়ি চাষি ও ক্রেতাদের মধ্যে বহু মধ্যবর্তী লোক চিংড়ি বিপণনের সাথে জড়িত। এসব মধ্যস্বত্বভোগীদের চিংড়ির ন্যায় একটি মূল্যবান সম্পদ সঠিকভাবে ক্রয়-বিক্রয় করার ব্যাপারে কোন জ্ঞান বা প্রশিক্ষণ না থাকায় অনেক সময়ে উৎপাদিত পণ্য বিপণনের পূর্বেই নষ্ট হয়ে যায়। এজন্য বিপণনের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গকে মানসম্মত বিপণন ব্যবস্থার ওপর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহন করা দরকার। সাথে সাথে চিংড়ি এলাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক বরফ কল ও অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন করা জরুরী।

আহরণের পর চিংড়ি টাট্‌কা রাখার জন্য করণীয় কাজ

- ধরার পর চিংড়ি রোদে না রেখে অবশ্যই ঘরের মধ্যে বা কোন চালের নিচে ছায়াযুক্ত ও ঠান্ডা জায়গায় রাখা।
- পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত মসৃণ পাকা জায়গা অথবা প্লাস্টিক পাত্রের উপর রাখা যাতে চিংড়ির গায়ে কোন ময়লা, ঘাসের টুকরা, ইত্যাদি লাগতে না পারে।
- পরিষ্কার ও শীতল পানিতে চিংড়ি ভালভাবে ধুয়ে শীতল ও পরিষ্কার করা।
- পরিষ্কার চিংড়ি বরফ বা ঠান্ডা পানির ট্যাংকে বেশ কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখা যেন চিংড়ির শরীরের সব জায়গা বরফের মত ঠান্ডা হয়ে যায়।

চিংড়ি পরিবহণকালীন বিবেচ্য বিষয়

- বরফের পানিতে ঠান্ডা করা আস্ত চিংড়ি কুচি বরফের মধ্যে প্লাস্টিকের বাক্সে ইনস্যুলেটেড (তাপ নিরোধক) ট্রাক বা ভ্যানে পরিবহণ করা।
- দিনের বেলায় সুর্যের আলো ও তাপের মধ্যে খোলা নৌকা, ট্রাক, ভ্যানগাড়ী, রিকশা বা সাইকেলে চিংড়ি পরিবহণ না করা।
- সবসময় চিংড়ির বাক্স ছায়াযুক্ত ঠান্ডা জায়গায় রাখা।
- পরিবহণে কত সময় লাগবে তা বিবেচনা করে বরফ ও চিংড়ির অনুপাত নির্ধারণ করা। সাধারণত চিংড়ি ও বরফের অনুপাত **১:১** হয়। দিনের তাপমাত্রাও এ ক্ষেত্রে একটি বিবেচ্য বিষয়।
- পরিবহণের সময় চিংড়িতে যেন তাপ না লাগে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা।
- প্যাকিং সামগ্রী হিসাবে বাঁশের ঝুড়ি, হোগলা পাটি, চট ও কলা পাতা ব্যবহার না করা।
- ধরার পর যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে চিংড়ি কারখানায় পৌঁছানো।
- পরিবহণের পর পরিবহণযান ও চিংড়ির বাক্স উপযুক্ত সাবান, ডিটারজেন্ট ও জীবাণুনাশক ঔষধ দিয়ে ভাল ভাবে ধুয়ে শুকিয়ে ফেলা।

৬. পুনরায় পোনা মজুদকরণ (Re-stocking)

বেশী উৎপাদন পেতে হলে পুকুরের উৎপাদন চক্র সারা বছর ধরে চালু রাখতে হবে। উৎপাদন চক্র চালু রাখার জন্যে যখনই যে প্রজাতির যত মাছ আহরণ করা হবে, সে প্রজাতির ততটি মাছ এবং ১০-১৫% অতিরিক্ত পোনা মজুদ করতে হবে। অর্থাৎ যদি ১০০টি মাছ ধরা হয় তবে ১১০-১১৫ টি মাছ ছাড়তে হবে। এ মজুদ পদ্ধতিই হলো পুনরায় মজুদ। এ জন্যে মাছ আহরণের পূর্বেই পোনার প্রাপ্যতা যাচাই করে দেখা উচিত। মাছ আহরণ ও পূনঃ মজুদ ঠিকমত করলে মাছের মোট উৎপাদন বেশী পাওয়া যাবে।

৭. মাছ চাষকালের রেকর্ড সংরক্ষণ (Record keeping)

মাছচাষ একটি লাভজনক ব্যবসা। এর মাধ্যমে অল্প সময়ে তুলনামূলক কম বিনিয়োগ করে অধিক মুনাফা অর্জন করা যায়। তবে মাছচাষের লাভ লোকসানের পরিমাণ অনেকগুলো বিষয়ের ওপর নির্ভর করে যেমন ঃ

- চাষ পদ্ধতি
- ব্যবস্থাপনা কৌশল
- উপকরণের সহজলভ্যতা ও মূল্য
- মজুদকৃত পোনার আকার
- উৎপাদিত পোনার চাহিদা
- মাছচাষে চাষির দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা
- প্রকৃতিগত অবস্থা

মাছচাষ কার্যক্রম পরিচালনা করতে মূলত মাছের পোনা, চুন, সার, খাদ্য, শ্রমিক, পুকুর সংস্কার ইত্যাদি খাতে পুঁজি বিনিয়োগ করতে হয়। স্থান, কাল, পাত্রভেদে উপরোক্ত উৎপাদন সহায়ক সামগ্রীক দাম কম-বেশি হতে পারে। সে কারণে মাছচাষের আয়-ব্যয়ের বিষয়টিও পরিবর্তনশীল। সার্বিকভাবে মাছচাষ কতটা লাভজনক তা নির্ণয় করার জন্য চাষকালীন যাবতীয় আয় ও ব্যয়ের হিসাব লিপিবদ্ধ করে রাখা উচিত।